সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস    বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩    মাঘ-চৈত্র ১৩৭১

THE RALEIGH
র‍্যালে
ভারতের সর্বাধুনিক সাইকেল
কারখানায় সেন-র‍্যালের তৈরী
SEN-RALEIGH
SRC-88 BEN

সমৃদ্ধির পথ
এই উপমহাদেশে সর্বত্র পরিব্যপ্ত লৌহপথ ধরেই আজ প্রসারিত। সমগ্র দেশকে একসূত্রে গ্রথিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে এই লৌহপথ, কিন্তু আপনাদের সহযোগিতার উপরই এর সামর্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।
এই জটিল লৌহজালের পরিচালন ব্যবস্থা নিতান্তই দুরূহ, এর প্রতিটি গ্রন্থির গুরুত্ব অপরিসীম; কোথায়ও সামান্যতম বিশৃঙ্খলায় সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হ'তে পারে।
পূর্ব রেলওয়ে
ARTADS
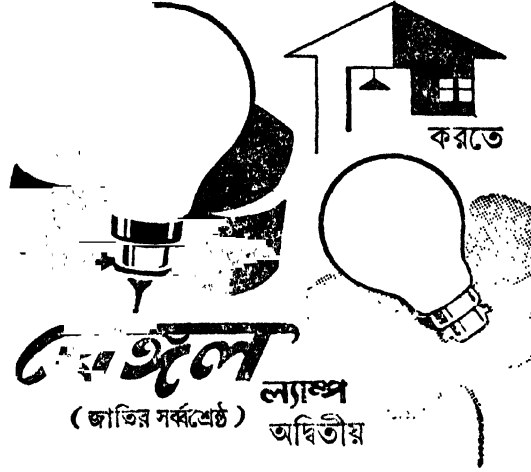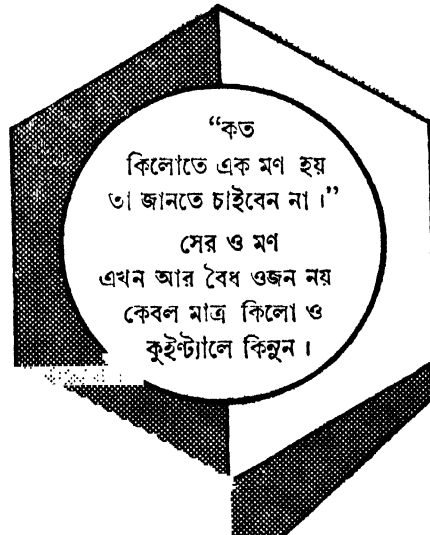
তখন সন্ধ্যে হব হব: মোহন স্ত্রীর সঙ্গে বসে চা পান করছিলেন। বাইরে তাঁদেরই ছেলে রাকেশ বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল।
হঠাৎ গাড়ীর ব্রেক কষার তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। দৌড়তে দৌড়তে এসে একটি ছেলে বলল, "রাকেশ গাড়ী চাপা পড়েছে"। রাকেশের মায়ের হাত থেকে চায়ের পাত্র পড়ে গেল। 'কি হয়েছে, কোথায় সে,' — তিনি ব্যস্ত হলেন। রাকেশকে ততক্ষণে বাড়ীতে বয়ে আনা হচ্ছিল — চোখ দুটি তার বোজা, কুঁকড়ে যাওয়া দেহটা রক্তমাখামাখি।
নিঃস্তব্ধ হাসপাতাল। রাকেশ অচৈতন্য। ছেলের শয্যাপাশে সস্ত্রীক মোহনকে দুঃস্বপ্নে ভরা তিন দিন তিন রাত্রি কাটাতে হল। প্রতীক্ষা আর প্রার্থনা করা ছাড়া তাঁরা আর কীই বা করতে পারতেন। রাকেশ সেরে উঠলে মোহন দুঃস্থদের কম্বল দান করবেন—এই মানত করলেন।
চারদিনের দিন সকালে রাকেশ চোখ খুলল। মোহনের প্রার্থনা দেবতা শুনেছেন। মানতের কথা মনে পড়ল তাঁর। অথচ কিছু এমন ধনী তিনি নন। তিনি খুবই অসুবিধা ও দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁকে এমন অবস্থায় কাটাতে হয়নি।
ঠিক যেন উপহারের মত তাঁর হাতে এসে গেল 'প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা'র পলিসির প্রথম কিস্তির ২000 হাজার টাকা। মানত রক্ষা হল।
পাঁচ বছর রাকেশ রইল পঙ্গু হয়ে। তারপর ডাক্তারেরা তার পায়ের ওপর অস্ত্রোপচার করতে মনস্থ করলেন। হাসপাতালের খরচ মেটাবার ভাবনা মোহনকে আবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। ভাগ্যক্রমে সেই সময় তাঁর পলিসির দ্বিতীয় কিস্তির ২000 হাজার টাকা পাওয়া গেল। ভাবনা রইল না আর।
মোহনের সমস্যার যেন অন্ত নেই। অস্ত্রোপচারের পর রাকেশকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। সবচেয়ে কাছে যে কলেজ, সেটিও ৪ মাইল দূরে। সেখানে রোজ হেঁটে পড়তে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তাকে লেখাপড়া ছাড়তে হল। তাহলে কি রাকেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। না। মোহনের কাছে ছিল জীবন বীমার পলিসির শেষ কিস্তির আরো ৬000 হাজার টাকা। এই টাকায় তিনি রাকেশের জন্য একটি আটা-কল খুললেন।
এখন রাকেশ এই আটা-কলটি চালায় এবং পিতামাতার দেখা শোনা করে।
রাকেশের জীবনে নতুন আলো
লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

---

# বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭১ · ১৮৮৬-৭ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

## সূচীপত্র



## চিত্রসূচী



মূল্য এক টাকা

বৃষ্টিস্নাত কোনারক

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে

# বিবেকানন্দ

কিছুদিন আগে বিবেকানন্দ
বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের
মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি; বলেছিলেন
দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ
আমাদের সেবা পেতে চান।
একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার
বাইরে মানুষের আত্মবোধকে
অসীম মুক্তির পথ দেখালে।
এতো কোনো বিশেষ আচারের
উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন
নয়। ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে এর
মধ্যে আপনিই এসে
পড়েছে, — ওর দ্বারা রাষ্ট্রিক
স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে
বলে নয়, ওর দ্বারা মানুষের

অপমানের দুঃখ হবে বলে, সেই
অপমানকে আমাদের
প্রত্যেকের আত্মাবমাননা। বিবেকা-
নন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের
উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্যে
দিয়ে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির
বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের
প্রবৃত্ত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বামী অশোকানন্দকে লিখিত পত্রের অংশ, ফাল্গুন ১৩৩৫

# বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'সমাজ', পূর্ব ও পশ্চিম, ১৩১৫

Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life···We must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them.

*Rolland and Tagore*, 1945

চরকাকাটা একটা বাহ্যক্রিয়া—এটাকে একটা লৌকিক আচার করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু আচার প্রায়ই প্রবল হ'য়ে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো একটা অভ্যস্ত দৈহিক কর্মকে যখনি উচ্চ সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো জায়গা দেয় আমাদের সমাজে তার অনেক প্রমাণ আছে। আরো একটা নতুন আচার যোগ ক'রে আমাদের মনোবৃত্তির জড়তা তাতে বাড়ানো হ'বে ব'লে আশঙ্কা করি।

একা একা ব'সে যাঁরা চরকা কাটেন তাঁরা মনে মনে ভাবতে পারেন যে চরকা কেটে সুতো উৎপাদন করে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করচেন। কিন্তু একথা মনে রাখতে বেশি লোকে বেশি দিন পারবে না—ক্রমেই এটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হ'য়ে বুদ্ধিকে ম্লান ক'রেই দেবে।

বস্তুত চরকা কাটো একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই এই জন্যে একথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার

পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্য্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙ্গুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সঙ্কীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান ক'রে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।

**সরসীলাল সরকারকে লিখিত**

**'চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য' শিরোনামায় প্রকাশিত, প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ**

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৩ সালে গৃহীত

# বিবেকানন্দের কবিতা ও জীবন

সুনীলচন্দ্র সরকার

বিবেকানন্দের রীতিমত কবিতার সংখ্যা কুড়ি-একুশটি হবে, এ ছাড়া তাঁর কবিতার কিছু কিছু লাইন ছড়িয়ে আছে তাঁর চিঠিপত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তব ( সংস্কৃত ) ও বাংলায় সাবেকি চালে লেখা শিব ও কৃষ্ণের ভজনগান দু তিনটি এই হিসাব থেকে বাদ দিচ্ছি। বাকি কবিতাগুলি আবার ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত এই তিন বিভিন্ন ভাষায় লেখা। এদের প্রেরণা : জীবনদর্শন, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, অধ্যাত্ম-উপলব্ধি। প্রথম তিন রকমের বিষয় জড়িয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে দশটি, তার দুটিমাত্র বাংলায়, বাকি আটটি ইংরাজিতে। যথা, সখার প্রতি, নাচুক হৃদয়ে শ্যামা, An Early Violet, Where Art Thou Gone, Angels Unawares, Requiescat in Pace, Hold on yet Awhile, To the Awakened India, Fourth July, The Song of the Sanyasin.

আর তাঁর আত্মিক বা মিস্টিক কবিতার তালিকায় স্থান দেওয়া যায় এই ন'টি কবিতাকে। সৃষ্টি, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, গাই গীত শুনাতে তোমায়, শিবস্তোত্রম্, অম্বাস্তোত্রম্, Kali the Mother, Who knows how the Mother, Peace ও Dream। এ ছাড়া তাঁর শেষজীবনের একটি চিঠিতে শান্তির আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি এমন গভীর আবেগময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে যে সেই গদ্যরচনাকেও একটি গদ্যকবিতা হিসাবে স্থান দিলে এই পর্যায়ে সংখ্যা দাঁড়ায় দশ। দেখা যাচ্ছে এই দশটি কবিতার মধ্যে চারটি বাংলা, দুটি সংস্কৃত ও বাকি ইংরাজি।

প্রায়ই দেখা যায় কোনো কোনো মহান্ ব্যক্তির অপ্রধান কর্মও জনচিত্তে তাঁর অমর স্মৃতির রাজ্যে স্থান দাবী করে; অনেক সময় তাঁর মাহাত্ম্য তাঁর গৌণ কীর্তিকেও একটা অযথা গৌরবের অধিকারী করে তোলে। রাজা রামমোহনের গান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কবিতা, মধুসূদনের ইংরাজি উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনীর কবিতা, তাই বা কেন— ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বহু ধর্মবোধসূচক সনেট ও কবিতা তাঁদের নামাঙ্কিত না হলে হারিয়েই যেত কতদিন আগে। স্বদেশে বিদেশে ন্যায্যলুপ্তি এড়িয়ে যাওয়ার উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। বিবেকানন্দের কবিতাকেও কি এই শ্রেণীর স্মৃতিসম্ভারের মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত? না তার নিজস্ব দাবী আছে অমরত্বের? কিম্বা হয়তো কাব্যমূল্যে গরীয়ান্ না হলেও তাঁর জীবনের গূঢ় প্রেরণা ও পরিণতির দিকনির্ণয়ে এগুলি বিশেষভাবে সহায়ক— তাই আমরা এদের রক্ষা করতে বাধ্য?

বিবেকানন্দের কবিত্বখ্যাতির প্রতিবন্ধক ছিল এবং আছে কয়েকটি। প্রথম এদের সংখ্যাল্পতা; দ্বিতীয় এদের ভাষার বিভিন্নতা। আধুনিকযুগে সংস্কৃত কবিতায় কি মৌলিক কবিত্বপ্রকাশ সম্ভব? ইংরাজিতে কাব্যসিদ্ধির সম্ভাবনাই বা কতটুকু। ইংরাজি বিবেকানন্দ ভালোই জানতেন। তাঁর ইংরাজি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে ভাবপ্রবাহ সংক্রমিত হত বিদ্যুতের মতো। কিন্তু ইংরাজি মীটার ও ইডিয়ম আয়ত্ত করবার তিনি সময় ও সুযোগ পেলেন কোথায়? বাংলায় তাঁর অসাধারণ অধিকারের নিদর্শন দেখি তাঁর গদ্যে, তাঁর পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, ভাববার কথা ইত্যাদি রচনায়, তাঁর অসংখ্য বাংলা চিঠিপত্রে।

বাংলা কাব্যেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা কাব্যের একটা স্বকীয় ডিক্‌শন ও স্টাইল গড়ে তুলতে যে সাধনা ও অভ্যাসের দরকার তার সময়ও তিনি পান নি। তাঁর সমস্ত কবিতাই রচিত হয়েছে একটা তাৎক্ষণিক আন্তর আবেগের তাগিদে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা পরিস্থিতির দাবী মেটাতে। কাজেই শ্রোতা ও পরিবেশ বুঝে তিনি বেছে নিয়েছেন ভাষা। সেগুলি অন্যরকম হলে, কিম্বা তিনি আরো বেশি দিন বাঁচলে, কিম্বা কাব্যের একটা স্বতন্ত্র মূল্য সম্বন্ধে আস্থাবান্ হয়ে কিছুকাল তাইতেই মন দিতে পারলে তার ফলও অন্যরকম হত। ইংরাজি ও বাংলা কবিতা তিনি নিশ্চয় আরো অনেক লিখতেন। ক্রমশ এই দুই ভাষাতেই তাঁর নিজস্ব একটা স্টাইলের আবির্ভাব হত। এবং কবি হিসাবে তাঁর মৌলিকত্ব ও গুরুত্ব বিচার করার কাজ সহজ হত।

কিন্তু অপরপক্ষে বলা যায় যেভাবে এগুলি লিখিত হয়েছে তাতে বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনার অর্থবোধের জন্য এরা অপরিহার্য। অতএব মূল্যবান ও রক্ষণীয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, শুধু এইটুকুতেই এদের মূল্য শেষ হয়ে যায় নি। এগুলির মধ্যে আছে সত্য কবিত্বের শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, অভ্রান্ত স্বাক্ষর। নরেনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যতগুলি শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন তার মধ্যে এই কবিত্বও নিশ্চয় একটি। এই কবিপ্রাণ যুবক কবিতা লিখে শুধু শখই মেটান নি, অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা তাঁর হৃদয়মনকে হিমশিলার মত গলিয়ে বইয়ে দিয়েছে কবিতায়। দীর্ঘ চর্চার অভাবকে ছাপিয়ে, ভাষা ও ছন্দের অনভ্যস্ততার বাধা এড়িয়ে ভিতরের সেই কাব্য বাইরে মুক্তি পেয়েছে। মৌলিকতা তাই ছন্দে বা ভাষাসজ্জায় ততটা স্পষ্ট না হয়ে উঠলেও তা আছে বিবেকানন্দের অনন্য মন ও প্রেরণার সবল স্পন্দনে— যা একটু মনোযোগ দিলেই এই কবিতাগুলির মধ্যে চিনে নেওয়া যায়। তিন ভাষাতেই বিবেকানন্দের কবিতা কাব্যরাজ্যে বিশেষ স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

রচনার তারিখ সাজিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত পাওয়া যেতে পারত তার আশা আপাতত ত্যাগ করছি। কারণ প্রধান কয়েকটি রচনার রচনা-তারিখ অজ্ঞাত। সৃষ্টি, প্রলয় বা গভীর সমাধি ( নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি ) ও সংস্কৃত স্তোত্রগুলি নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ-তিরোধানের কাছাকাছি, অর্থাৎ আমেরিকা-যাত্রার অনেক আগে লেখা। 'গাই গীত শোনাতে তোমায়' ১৩০৮-৯এর উদ্বোধনে প্রকাশিত, অর্থাৎ ১৯০১ সালে বা পরে। অথচ এর প্রথম উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে বিবেকানন্দের ১৮৯৪ সালের আমেরিকা থেকে লেখা এক চিঠিতে। 'নাচুক হৃদয়ে শ্যামা'ও প্রকাশিত ১৯০০ সালের পরে, লেখা কখন জানা নেই। সম্ভবত ১৮৯৪-৯৫ সালে। 'সখার প্রতি' সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য।

কিন্তু ইংরাজি কবিতাগুলির রচনাকাল তত অনিশ্চিত নয়। The Song of the Sanyasin লেখা হয় ১৮৯৫ সালে। তার আগে চিকাগো কন্‌ফারেন্সের ঠিক আগে ১৮৯৩ সালে লেখা O'er Hill and Dale। বাদবাকি কবিতার মধ্যে প্রধান পাঁচটি লেখা ১৮৯৮ সালে, এবং Peace ও Dream এই দুটি ১৮৯৯ ও ১৯০০ সালে।

এই হিসাব থেকে সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হবে না যে বিবেকানন্দের সুপ্ত বা অবহেলিত কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয় পাশ্চাত্ত্য জীবন ও কর্মজগতের সংস্পর্শে। তাঁর মোট কাব্য-রচনাকাল ১৮৯৩ থেকে ১৯০০, এই আট বৎসর ধরলে এর মধ্যে তাঁর কবিমানসের ক্রমপরিণতির কোনো নিদর্শন আবিষ্কারের চেষ্টার তেমন কোনো অর্থ নেই। আমেরিকা-প্রবাসের আগেই ভারতপরিক্রমারত সন্ন্যাসীর আভ্যন্তর পরিণতি

যা হয়েছিল তাকেই বলা যায় একটা যুগান্তর। তবে বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে একটা নতুন সামঞ্জস্য-বিধানের যে দৃষ্টান্ত তাঁর গদ্যরচনায় দেখা যায় তার ছাপ আছে তাঁর ইংরাজি কবিতাগুলির মধ্যে। তাছাড়া মোটামুটি বিচারে তাঁর সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা কয়টি পূর্বতর ও ইংরাজি কবিতাগুলি পরবর্তী কালের। ভাষা ও ভাবসংহতি এবং কাব্যিক উৎকর্ষের বিচারেও তাই ইংরাজি কবিতাগুলিকে বেশি সার্থকতা ও maturity বা পরিপূর্তির গৌরব দেওয়া যায়।

**আত্মজীবন রস**

এর আগে আমরা কবিতাগুলিকে দু' ভাগে ভাগ করেছিলুম, কিন্তু দু শ্রেণীরই কয়েকটি কবিতায় বিবেকানন্দের আত্মজীবনের ইঙ্গিত ও বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথমেই এই তথ্য ও রসটুকুকে আলাদা করে নিয়ে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

তাঁর একটি সংস্কৃত স্তোত্রেই অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মজীবনের উল্লেখ পাই। অম্বাস্তোত্রম্ নিছক প্রথাসুলভ রচনা নয়। বিবেকানন্দ তাঁর মাকে বিশেষ করে স্পষ্ট করে দেখে বুঝেছেন তিনিই 'ধৃতকর্মপাশা', তাঁর জীবনের কর্ম পরম্পরাকে তিনিই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়েই তাঁর এই অগ্রগতি, কিন্তু তাতেই এই দেবীর কৌতুক, কারণ তিনি জানেন এর মহৎ পরিণামকে, এর সম্পূর্ণ লাভালাভের হিসাবটিকে। বিবেকানন্দ এই কথা মেনে সফলতা বিফলতার আর চিন্তা না করেই নিজের জীবনটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন এই মায়ের কাছে।

যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসংসিদ্ধেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ
যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা।

যা তাঁর পক্ষে দুঃখমার্গযাত্রা তাই মায়ের কাছে তাঁর নিজের উদ্ভাবিত ললিত বিলাসের ব্যাপার— এই ধরণের ভাব আমাদের রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা উপলব্ধির এক দিক্ মনে করিয়ে দেয়। বিবেকানন্দের অম্বা তাঁর জীবনদেবী ধৃতকর্মপাশা তো বটেনই, তবে তিনি শুধু রহস্যময়ী নিরুদ্দেশের অভিসারিকা ততটা নন। বরং তিনি নিষ্ঠুরা কিন্তু মহতী সিদ্ধিদায়িনী। রবীন্দ্রনাথের 'রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোর স্বামিনী'র সগোত্রা। তবু এঁর আহ্বানই, রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি মেনে নেবেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। 'মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা ক'রে তোমার আহ্বান'। বিবেকানন্দ যে সত্যই তাই করেছিলেন তা তাঁর শেষজীবনের কাব্য উচ্চারণের মধ্যে স্পষ্ট। তাঁর Kali the Mother, Who Knows How the Mother Plays এই দুটি গভীর কবিতা এবং তাঁর কাব্যময় এক গদ্যরচনায় —যার উল্লেখ আগেই করেছি— হঠাৎ জীবনের মর্ম থেকে নিঃসারিত ধ্বনি 'যাই! মা যাই!' নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে তাঁর সেই প্রথম আত্মনিবেদনের পরিণাম।

দুটি কবিতায় তিনি প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা। চিকাগো বক্তৃতার তিন মাস আগে তাঁর সাহায্যকারী বন্ধু অধ্যাপক রাইট্‌কে তিনি একটি চিঠি লেখেন, তারই মধ্যে লিখে পাঠান O'er Hill and Dale কবিতাটি। 'কয়েক লাইন লিখে পাঠাচ্ছি— কবিতার মত ক'রে।

এই অত্যাচারটুকু আপনি ভালোবেসে ক্ষমা করবেন আশা করি।' সম্পূর্ণ হতাশার পর সেই বিদেশে আশার আলো দেখে বিবেকানন্দের প্রথমেই মনে পড়েছিল রামকৃষ্ণকে, এবং তাঁর হৃদয় তাঁকেই নিবেদন করতে চেয়েছিল আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, প্রেম। তাঁর সঙ্গে স্থান কালের সমস্ত বাধার মধ্যেও নিজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিবেকানন্দ এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

From that day forth wherever I roam
I feel him standing by,
O'er hill and dale, high mount and vale
Far, far away and high.

এই আত্মোদ্ঘাটন মর্মস্পর্শী। কিন্তু কাব্যকলা কিছুটা অপরিণত। কবিতাটিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ballad ( গাথা ) স্টাইল ও ছন্দের অনুকরণ সুস্পষ্ট।

'গাই গান শুনাতে তোমায়' কবিতায় এই আনুগত্য ও ভক্তিনিবেদন আরো মর্মস্পর্শীভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অজ্ঞানতাবশে তিনি গুরুর প্রতি কত অনুচিত আচরণ করেছেন তার জন্য অনুশোচনা, প্রভুর তা সত্ত্বেও অবিচল করুণা ও ক্ষমা মনে করে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস, এবং তাঁর মধ্যে বিশ্বের মহত্তম রহস্যের আবিষ্কার সম্বন্ধে নিঃসংশয় ঘোষণা এই কবিতাটিকে বিবেকানন্দের অন্তর্জীবনের একটি প্রামাণিক নির্দেশক হিসাবে মূল্যবান করেছে।—

ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখ পানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।

আত্মজীবনীর দিক থেকে এর মূল্য অসামান্য। কাব্যিক প্রকাশ হিসাবেও এর একান্ত মর্মসত্যতা ( sincerity ) তীক্ষ্ণ সায়কের মতো সহানুভূতিশীল পাঠকচিত্ত বিদ্ধ করে। এর আপাত-বিশৃঙ্খল ভাব ও চিন্তা আরো নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করে এমন একটি অনন্যসুলভ সদ্যোজাত অভিজ্ঞতার যা একান্ত নিজস্ব। এর আবেগস্পন্দের মধ্যে পাই কিছুটা সেই অর্জুনের আকূতির সুর : 'সখেতি মত্বা প্রসভং

যত্নুক্তং, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি!· · যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি,· · তৎক্ষাময়ে' ইত্যাদি। সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্যেও পুত্রভাব, সখাভাব, সাযুজ্য বা সোহহম্ ভাব পরস্পর মিশে গিয়েছে। কিন্তু কাব্যসিদ্ধির দিক থেকে তেমন প্রশংসা করা যায় কিনা সন্দেহ। বন্ধু গিরিশ ঘোষের ছন্দ নিয়ে এখানে বিবেকানন্দ পরীক্ষা করে দেখছেন। এই গৈরিশ ছন্দে অনুশীলনের ফলে তাঁর সাফল্য নিশ্চয় আরো বাড়ত। কিন্তু আপাতত বিবেকানন্দের মতো কবির কণ্ঠে এই রকমের ভাষা ও ছন্দের প্রবাহ মানায় নি। বাংলা কবিতার সমকালীন বিবর্তনধারার সঙ্গে তুলনা করলেও একে একটু পিছিয়ে থাকা, একটু অপরিণত বলে মনে হবে।

বরং 'সখার প্রতি' কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ অনেক বেশি মানানসই হয়েছে। এর মধ্যে যেটুকু আত্মজীবনবর্ণনা আছে তা বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী—

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো। প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায়, ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?

মধুসূদনের সেই আত্মবিলাপ—'কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে'— খানিকটা তারই মত তীব্র সুর বেজেছে এখানে বিবেকানন্দের কণ্ঠে। কিন্তু এই সুরে মিশেছে তাঁর নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী উদার বৈরাগ্যের সুর। তাই এ শুধু বিলাপই নয়, মহত্তর উপলব্ধিতে পৌঁছোবার আগেকার আবেগ সংকেত। ঐ বেদনার প্রস্থানের মধ্য দিয়েই তিনি পৌঁছোলেন এক মহৎ জীবনসত্যে। এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার বজ্রবিদ্যুতে এই মাটিঘেঁসা ভারী চিন্তনের ছন্দোবাহনটি হঠাৎ যেন পরিণত হল এক দীপ্ত আকাশযানে—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

একই শব্দ দিয়ে মিল, ভাবটাও সহজ গদ্যে বললে অতি চেনা ও পুরাতন— অন্ততঃ ভারতীয় জনসমাজে। কিন্তু কাব্যচেতনা, ঋষিসুলভ সম্বিৎএর স্পর্শে যেন বেজে উঠল দুটি লাইন এক অনৈসর্গিক শঙ্খের মতো।

**জীবনদর্শন, দেশ**

জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে দুটি ইংরাজি কবিতায়। Requiescat in Pace—তাঁর অনুগত বন্ধু নিঃস্বার্থ সহায়ক Goodwinএর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে লেখা; ও Hold on yet Awhile—তাঁর গুণগ্রাহী ভক্ত ও সহায়ক খেত্রির মহারাজকে তাঁর কোনো দুঃখ বিপর্যয়ের দিনে সান্ত্বনা দেবার জন্য লেখা। মৃত্যুর পরও থাকে অবাধ স্বাধীনতা ও নিবিড় প্রেম-নীড়, এবং সেখান থেকেও এই জগতের দিকে প্রসারিত করা যায় প্রেম ও সেবা— এই হল প্রথম কবিতার ভাব। গভীর বিয়োগবেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছে এই সান্ত্বনা, মৃত্যুজয়ের এই প্রত্যয়। বিবেকানন্দের ব্যক্তিচরিত্র তাই এতে প্রতিফলিত। কবিতাটিও বেশ সুলিখিত। যদিও এতে ম্যাথু আর্নল্ডের Requiescat কবিতাটির কিছু প্রভাব দেখা যায়। মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী কবিদের মধ্যেও এই

রকমের পারস্পরিক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতায় Shelleyর West Wind এর মডেলের প্রভাব দেখা মানে তাঁর প্রতিভাকে গৌণ করা বোঝায় না। কাব্যের ভাবকাঠামো সম্বন্ধে কিছুটা পূর্বতন কবির মডেল অনুসরণ কাব্যচর্চার প্রাথমিক অবস্থায় অনিবার্য।

Hold on yet Awhile কবিতাটিতে বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। তাঁর বেদান্ত, তাঁর অদ্বৈততত্ত্ব জীবনকে অস্বীকার করায় না, বরং কর্মকে মহৎ মর্যাদা দেয়, জীবনের প্রতিটি সত্য কীর্তিকে দেয় অমরত্বের আশ্বাস। এই কবিতাটিও সুলিখিত এবং এতে একটা উৎসাহপ্রেরণাব্যঞ্জক ছন্দের দোলা বেশ ফুটেছে। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে এতে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার অনুরণন দেখা যায়। একটি কবিতার সামান্য একটু প্রতিধ্বনি যথা, 'Not a work will be lost, no struggle vain,···No good is e'er undone' এর মধ্যে 'যে ফুল না ফুটিতে· ·জানি হে জানি তাও হয় নি হারা'র। এবং সমস্ত কবিতাটির ভাব ও ছন্দ-বন্ধনে 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে'র। ইংরাজি কবিতাটির প্রথম চার লাইন থেকেই এই মিল ধরা পড়বে:

If the sun by the cloud is hidden a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.

এই কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯৮। দুঃসময় কবিতার প্রকাশের তারিখ ১৫ বৈশাখ ১৩০৪।

এর পর আমরা আলোচনা করব বিবেকানন্দের তিনটি প্রধান কবিতা যার মধ্যে তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কাব্যপ্রতিভা একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ লাভ করেছে: Angels Unawares, নাচুক হৃদয়ে শ্যামা ও The Song of the Sanyasin— এই তিনটির মধ্যে Angels Unawares লেখা হয় সবচেয়ে পরে, ১৮৯৮এর নভেম্বরে। The Song of the Sanyasin লেখা হয় ১৮৯৫ সালে নিউইয়র্কের Thousand Island Parkএ। আলোচনার মধ্যে উঠে ঘরের ভিতরে গিয়ে অতি অল্পসময়ের মধ্যে এই কবিতাটি সমস্ত লিখে এনে বিবেকানন্দ তাঁর অনুরাগী সহচর ও অভ্যাগতদের দেখিয়েছিলেন— এই বর্ণনা পাওয়া যায় এক আমেরিকান ভক্তের স্মৃতিলিখনে। 'নাচুক হৃদয়ে শ্যামা' উদ্বোধনে প্রকাশিত ১৩০৬-৭এ। লেখা অনুমান করি পাঁচ-ছয় বৎসর আগে।

শঙ্করের বুদ্ধিবৈরাগ্য অদ্বৈতসিদ্ধি আর বুদ্ধদেবের ব্রহ্মবিহার প্রেম জগতের জন্য নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ— এই দুই ধাতুর মিশ্রণে তৈরি বিবেকানন্দের ব্যক্তিচরিত্র। তাঁর নিজের রচনায় চিঠিপত্রে এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাবে। নির্বিকল্পের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু জগৎকেও তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দেন নি, তাকে স্বীকার করেছেন, এ জগৎপ্রসবিনী ধৃতকর্মপাশা মাতৃরূপিণীকে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু এ ছাড়া আরও এক দিকে তাঁর চারিত্রিক পরিধির বিস্তার ঘটেছে। রামমোহন-প্রবর্তিত পথেও তিনি পৃথিবীর দেশ সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্রমিক পরিণতির ধারা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। এই দিকেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার সাক্ষ্য তাঁর পর্যটক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত ইত্যাদি রচনায় প্রচুর পাওয়া যাবে। এমনকি পাশ্চাত্ত্য জীবনের অপ্রতিরোধ্য রাজসিকতার আদর্শ থেকেও কর্মবিমুখ ভারতের অনেক কিছু শেখবার আছে এমন কথাও তিনি বলেছেন। অর্থাৎ যেসব ভাবাদর্শের সংশ্লেষণে রবীন্দ্রজগৎ

তৈরি, সেইগুলি প্রায় সমস্তই পাওয়া যাচ্ছে বিবেকানন্দের চিত্তভূমিতে। তবু দু জনের মধ্যে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও দু জনের স্বাতন্ত্র্যও অনন্য রেখাবন্ধে উৎকীর্ণ। মতবাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য, বা পার্থক্যও হয়তো ততটা নয়, মাত্রাভেদ ( emphasis ) আলোচনা করলে দু জনের এই তফাতটা কিছুটা বোঝা যাবে। আর কিছুটা হচ্ছে শুধু ব্যক্তিক নির্বাচন ( personal preference )এর ব্যাপার, ব্যক্তিত্বরূপ বিকাশের আর্ট। এমনকি অদ্বৈতভূমিও একেবারে একঘেয়ে একাকার জায়গা নয়। একতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র সত্তার অস্তিত্ব সেখানে আরো ভালোভাবেই থাকতে পারে ও আছে।

প্রথমে বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখা যাক এই কবিতাগুলি।

'নাচুক তাহাতে শ্যামা'য় ঠিক যেন দাঁড়িপাল্লার মাপের মতো ক'রে পৃথিবীর সুখকর সমস্ত অভিজ্ঞতা একদিকে ও দুঃখকর ভয়ঙ্কর যত অভিজ্ঞতাকে আর-এক দিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যেও এক দিকে শোভন সুষম সুন্দর, অপর দিকে ঝড় বজ্র ভূমিকম্প ইত্যাদির প্রলয়রূপ। মানুষের জীবনেও নানা সৌন্দর্যকলার সমাবেশ, ভোগের আয়োজন, প্রেমের অঙ্গন রচনা একদিকে ; অন্যদিকে দ্বন্দ্ব রেষারেষি যুদ্ধের চরম নৃশংসতা। মানুষ যা প্রিয় সুখকর তাই আসলে চায়, কিন্তু পায় কি ? 'সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা'। জীবনের যে রুদ্ররূপ তাকে মানুষ হয় সন্তুষ্ট করতে চায় 'দয়াময়ী' এই চাটু প্রশংসার দ্বারা, নয় সম্পূর্ণ তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সত্য আছে ঐ কালীর স্বরূপে। তাঁর নগ্ন ভয়ানকরণরঙ্গিনী মূর্তিতেই। ভয় ত্যাগ করে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। হৃদয় থেকে সমস্ত সুখস্বপ্ন দূর করে তাকে শ্মশান করে ফেলতে হবে। মানতে হবে 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার', তখন সেই হৃদয়-শ্মশানে শুরু হবে শ্যামার নাচ।

এই কবিতায় যে বৈরাগ্যের অনমনীয় কঠোরতা, সংসারযাত্রা পরিহারের যে নির্মম নির্বন্ধ দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে শঙ্করের একরোখা জগৎবর্জন-ব্যগ্রতার তফাত কি ? এও তো সেই 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' বলে সমস্ত মানবিক সম্পর্কের মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা। বরং 'সখার প্রতি' কবিতায় যা এর আগেই কিছুটা আলোচিত হয়েছে, প্রেম ও সেবার দ্বারা সংসারের সঙ্গে যোগরক্ষার একটা সঙ্কল্প আছে। এখানে কিন্তু একেবারে সেই পুরাণো বাঙলা গানের প্রতিধ্বনি :

> শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি
> শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।

কাব্যকলার দিক থেকে বিচার করলে এই কবিতাটিকে বিবেকানন্দের বাংলা কবিতাগুলির মধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দ, স্টাইল, দার্শনিক চিন্তার প্রবাহ কাব্যের ভূখণ্ডে প্রবাহিত করবার চেষ্টার অনুসরণ পরবর্তী আর কোনো কবি করেছিলেন কি না জানি না। কিন্তু বিবেকানন্দের এই কবিতাটিতে তাই পাই। প্রকৃতির রূপরসধ্বনির প্রতি কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের সচেতনতার ও ইন্দ্রিয়-প্রতিবেদন ক্ষমতার একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

> হেতায় ঝরঝর, ঝরঝর, ঝরণা ঝরে।
> পাদপ, মরমর, মরমর শব্দ করে ॥
> কি জানি, কোথা হতে, বায়ু পথে, আসিছে গীত,
> বীণার ঝঙ্কার হয় আর আচম্বিত।

এর পাশে রাখা যাক 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' থেকে

চিত্রকর তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয় ভাবরাশি জেগে ওঠে।

সূর্যকরস্পর্শে রূপের জগৎ এর প্রতিদিনকার নূতন সৃষ্টির বর্ণনা। আবার যুবকযুবতীর প্রণয়খেলার বর্ণনা হচ্ছে এই :

বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর— বাঞ্ছা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখি।

প্রকৃতিসম্ভোগের ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল যথেষ্ট। তাঁর কাব্যে ঐ রসে সিক্ত বর্ণনা বা ভাবমূর্তিগুলি বেশ জীবন্ত, চিন্তার রথের চাকার তলায় তারা পিষ্ট হয়ে যায় নি। বিবেকানন্দেরও মন প্রকৃতির সৌন্দর্যলোককে সাড়া দিত সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রেমের রসও যে তিনি অন্ততঃ বুঝতেন তা উপরের দুটি লাইন থেকে বোঝা যায়। শঙ্করের মত নিষ্করুণতার অপবাদ তাঁকে দেওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের কাপুরুষতা আদর্শভ্রষ্টতা দেখে তাদের চারিত্রিক ব্যাধি লক্ষ্য করে তাঁর এই সাময়িক নির্মমতা, এই কঠোর প্রতিষেধকের প্রস্তাব। তান্ত্রিক শ্মশানসমারোহের morbidity কিছুটা আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও আসলে বিবেকানন্দচিত্তের সাহস ও ওজস্ এই কবিতার মেজাজ ও রসোৎক্ষেপকে অনন্যসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তাই তিনি যখন কবিতা শেষ করেন এই বলে

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।—

তখন এই mood অনেকটা গিয়ে স্পর্শ করে রবীন্দ্রনাথের সেই ধরণের চিত্তভঙ্গীকে যা সর্বনাশকেও আহ্বান করে, হতাশায় নয়, নূতন সূচনা বা অগ্রগমনের আশায় ; যথা, 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' ইত্যাদি।

একটা মন্তব্য না ক'রে পারছি না যে বাংলা কাব্যরচনায় কিছুদিন সময় দিলে ঐ 'না ডরাক তোমা'র 'তোমা' বিবেকানন্দকে লিখতে হত না। এই কবিতাতেই তাঁর বাংলা ভাষা ও ছন্দের উপর যে অধিকার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার প্রেরণায় সহজেই তাঁকে অনেক বেশি উৎকর্ষের অধিকারী করত।

তত্ত্বের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দের জীবনদর্শন মোটামুটি সেই সখার প্রতি কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য কবিতাগুলিতে ভাববৈচিত্র্য ভঙ্গী ও রসের পার্থক্য যাই থাক, মোট কথাটা সেই এক। অসার যা পরিত্যাগ করো, যা সার বস্তু সেই সচ্চিদানন্দকে লাভ করো, মানুষের জগতের সঙ্গে যুক্ত হও প্রেম ও সেবার দ্বারা। নিম্নপ্রকৃতি থেকে সন্ন্যাসীর বৈদান্তিক ত্যাগ চর্যা সাধনে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে করো ব্রহ্মবিহার, আবার দুর্যোগ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে কালীকে লাভ করো, লাভ করো সেই ভয়ঙ্করীকে যিনি 'ধৃতকর্মপাশা' জগতের নেত্রী। এই বাণীই আছে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ দুইটি কবিতা The Song of the Sanyasin ও Kali the Mother এ। বক্তব্যের দিক থেকে Kali the Mother ঐ 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'রই যেন ইংরাজিতে পুনরুচ্চারণ— অবশ্য অনেক বেশি গভীর উপলব্ধি ও বিদ্যুৎগর্ভ প্রেরণা সঞ্চারের সহযোগে। শুধু Angels Unawares কবিতাটি যা সব দিক দিয়েই বিস্ময়কর

ও কৌতূহলোদ্দীপক— বিবেকানন্দের মনে পাশ্চাত্যজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার একটা সাক্ষ্য উপস্থিত করেছে। বিবেকানন্দের মন যে ছিল সম্পূর্ণ স্বকীয় ও স্বাধীন, সেখানে কোনো বাঁধা মত বা dogma, কোনো পরম্পরা-প্রাপ্ত দার্শনিক ফরমুলা বা ধর্মীয় ভাববিগ্রহ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমর্থন ছাড়া প্রবেশের অধিকার পেতে পারে না এ কথা যাঁরা বিবেকানন্দ-চরিত্র কিছুমাত্র অনুধাবন করেছেন তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। তাঁর ভাবজগৎ নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রসারণশীল, নতুনভাবে আত্মসংস্থাপক ( self-adjusting )। কাজেই তাঁর সন্ন্যাসও শুধুমাত্র প্রথানুযায়ী আনুষ্ঠানিক সাধন নয়। তাঁর বেদান্ততত্ত্বেও যুক্ত হয়েছে নূতন একটা হৃদয়াবেগ। তাঁর কালীদর্শনেও ভয়ঙ্করের সঙ্গে মিলেছে শিশুর মাতৃনির্ভরতা ( মা, মা, যাচ্ছি ), তাঁর জগৎএর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে রয়েছে বৈরাগ্যের সঙ্গে স্নেহ প্রেম সখ্য, আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে সেবার অরোধ্য আবেগ। এইসব জিনিসই আমরা পেয়েছি তাঁর কবিতায়। এগুলি না থাকলে বিবেকানন্দের অন্তঃপ্রকৃতির ঐশ্বর্যের সংবাদটি এমন ক'রে আমাদের কাছে পৌঁছোত না।

এখন যা বলছিলুম, ঐ Angels Unawaresএ দেখি বিবেকানন্দের মন সংসারের বর্তমান রূপকে শুধু করুণা বা সহনশীলতার দ্বারা মেনে নেওয়া নয়, আরো এগিয়ে এসে তাকে বুঝে নিতে— এমনকি আশীর্বাদ করতে প্রস্তুত। গাছপালা পশুপক্ষীর উত্থান পতন পাপ পুণ্য নেই, মানুষের আছে। আর সেইটেই মানুষের গৌরব। সে থেমে নেই, সে এগিয়ে চলেছে সৃষ্টির খোলা রাস্তায়। এই অগ্রযাত্রার অভিযানে ভুল দুঃখ তাপ এমনকি পাপেরও একটা মূল্য আছে। তাই তাঁর কবিতার তৃতীয় স্তবকের লোকটি এই কথা বুঝতে পেরে পাপের জন্যও ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে :

—he blessed the fall,
And, with a joyful heart, declared it—
'Blessed Sin !'

প্রতিটি মানুষকে তিনি সন্ন্যাসী ফকির ক'রে তুলতে চাচ্ছেন না। ইতিহাস তাদের জীবনের যে সত্য ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে যুগযুগান্তর ধরে, তাইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাইছেন। To The Awakened India— যা বোধ হয় ভারতকে জেগে উঠে পৃথিবীতে তার নূতন ভূমিকা গ্রহণ করবার প্রথম নিঃসংশয় উদাত্ত আহ্বান— তাইতে বিবেকানন্দ চেয়েছেন কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার দুঃস্বপ্ন নাশ, সম্পূর্ণ স্বপ্নমুক্ত হবার ক্ষমতা না থাকলে অন্তত: সত্যতর মঙ্গলতর স্বপ্নের আয়োজন— যা হল প্রেম ও সেবা। এরও পরে অবশ্য সত্যের নিষ্কল নির্বিকল্পরূপ— তা না পেলেও চলবে।

Let visions cease,
Or, if you cannot, dream but truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

মানুষের এই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফল হবার জন্য চাই পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতা। তাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তিনি দেখলেন—

Oh sun, today thou sheddest liberty,

একটা উদার নৈর্ব্যক্তিক সহানুভূতি ও প্রেমের আকাশমণ্ডলের মধ্যে স্নেহ ভালোবাসার মানবিক

সম্পর্কের একটা ব্যক্তিগত রূপও ফুটে উঠতে পারে অতি হৃদয়স্পর্শীভাবে। বিবেকানন্দের সাঁওতাল মাঝির প্রতি ব্যবহার, নিবেদিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎএর দিন তাঁর আচমনের জন্য হাতে জল ঢেলে দেওয়া ইত্যাদি অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। ১৯০০ সালে শিষ্যা Christineকে লেখা চিঠিতে Dream নামে একটি কবিতায় তিনি চাইছেন এই কঠোর জগতে একটু স্নিগ্ধ স্বপ্নের কোমলতা। নির্মম বৈদান্তিক স্পষ্টতা, নিরাবরণ সত্যের রূঢ় আলোকস্পর্শের থেকে একটু আড়াল দুর্বল মানুষের জন্য। বিবেকানন্দের মুখে এই কোমলতার আবেদন, এই একটু স্নেহের প্রশ্রয় কত মিষ্ট।

> Thou dream, O blessed dream!
> Spread near and far thy veil of haze,
> Tone down the lines so sharp,
> Make smooth what roughness seems.
> No magic but in thee!
> Thy touch makes deserts bloom to life,
> Harsh thunder blessed song,
> Fell death the sweet release.

#### মিস্টিক ও আধ্যাত্মিক কবিতা

বাংলা সাহিত্যের প্রাক্-আধুনিক কয়েক শতাব্দী ধরে কবিদের লিরিক ব্যঞ্জনপ্রয়াস কেবলি পাক খেয়েছে কয়েকটি প্রথাসিদ্ধ প্রতীককে ঘিরে: কালী, শিব, রাধা, কৃষ্ণ — এবং এঁদের লীলা। মঙ্গলকাব্যের যুগের পূজাপ্রাপক সব দেবতারাও এই তালিকার অন্তর্গত। কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি, দর্শন, আবেগ, মানসপ্রতিক্রিয়ার কোনো স্বাতন্ত্র্য, কোনো সত্য আবেদন, কোনো কাব্য বা কল্পনামূল্য না থাকলেও রাশি রাশি নূতন কবিতা গান লিখিত ও পঠিত বা গীত হত। এমনকি ভারতচন্দ্রের মত বিদগ্ধ কবিও শুধু নিপুণ সূত্রধার ও মঞ্চাধ্যক্ষের মত দেবদেবীদের সভ্য সাজে সাজিয়ে বেদীতে তুলে দিয়েছেন, তাদের স্তবের ভাষায় ছন্দে দিয়েছেন সংস্কৃতির নূতন বর্ণ ও ঝঙ্কার। কিন্তু তারা যে শুধু স্থির নিষ্প্রাণ বিগ্রহ এ সম্বন্ধে তার কবিচিত্তেও কোনো দ্বিধা নেই, পাঠকচিত্তেও থাকবার কথা নয়। কিম্বা যেমন আমাদের ক্লাসিকাল গানে হয়, পুরোনো রীত রেওয়াজ গায়কী সব রেখে নতুন ওস্তাদ শুধু একটু নতুন কায়দা আরোপ করেন, ভারতচন্দ্রের সেরা কবিতারও সেইটুকুই বৈশিষ্ট্য— যেমন, 'রে সতী রে সতী কান্দিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ'।

এই তো গেল যা সেরা। অক্ষমদের হাতে জপের মালাঘোরানোর মত একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির জন্য এই প্রতীকগুলি এমন নীরস ও অরুচিকর হয়ে উঠল যে আধুনিকমনস্করা এই ধরণের সমস্ত কাব্যকেই কাব্যনামের অযোগ্য বলে নির্বাসন দিয়েছেন। তার ফলে দেখছি সত্যকার গভীর প্রেরণাজাত অনেক কবিতাকে শুধু কালী শিব কৃষ্ণ ব্রহ্ম বা বিশ্বপিতা জগন্মাতার নাম সংযোগ আছে বলেই আমরা কাব্য-জগতে প্রবেশাধিকার দিই নি। আমাদের কাব্যসংকলনে তাই রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের অতি চমৎকার লিরিককেও প্রাপ্য আসন দেওয়া হয় নি। চমৎকার সব ব্রহ্মসঙ্গীতকেও নয়। বৈষ্ণব কবিতার প্রেমের

উপাদান তাকে আধুনিক লোকের চক্ষে কাব্যমর্যাদা দিয়েছে, রাধা ও কৃষ্ণের মিস্টিক বা আধ্যাত্মিক সত্য নয়। বাউলগানও সাধারণ জীবনদর্শনের ছাড়পত্র নিয়ে ঢুকেছে— অনেকটা রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে। অধ্যাত্মিক, মিস্টিক, ভক্তিমূলক কবিতাকে যাঁরা স্বীকারও করেন তাঁরাও তাদের সরিয়ে রাখতে চান আলাদা ক'রে। তার উদাহরণ *The Oxford Book of English Mystical Verse*।

অধ্যাত্মসত্য যে শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ নির্মাণভূমি তা আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে। জগতের গূঢ়তম সত্যের অনুসন্ধান, তারই রূপায়ণের ফলেই কবি সাধক যোগী ঋষি সকলেই পৌছোন অন্তর্লোকের সত্যে— তার একটা দিগন্ত জীবন্ত ব্যক্তিবিগ্রহে ভরা, সেখানে সত্যের ঘনীভূত সারসংকলন হিসাবে দেখ দিতে থাকে কৃষ্ণ কালী যীশু মেরি উর্বশী ভিনাস ইন্দ্র জুপিটার প্রভৃতি, অপর দিগন্তে সত্যের, শান্তির সমুদ্র, জ্যোতি, আনন্দ ইত্যাদির নৈর্ব্যক্তিক বিস্তার। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ যখন বলেন 'And I felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts' তখন তা প্রথম অভিজ্ঞালোকের কথা। শেলি যখন হঠাৎ দেখা পান তাঁর Intellectual Beautyর, তাঁর দেবী সরস্বতীর, আর সেই আবিষ্কারের বিস্ময় তাঁর মর্ম ছিন্ন করে বার করে নেয় স্বীকৃতির আনন্দবিদ্ধ চিৎকার তখনও তিনি আওতায় পৌছেছেন ঐ প্রথম লোকের—

Sudden, thy shadow fell on me,
I shrieked, and clapsed my hands in ecstasy.

আবার মিল্‌টন যখন আবাহন করেন Hail, holy light, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ধ্যান করেন সেই আলোর 'the light that never was on land or sea', বা শেলি বলেন 'the white radiance of Eternity'র কথা, তখন তাঁরা প্রবেশ করেছেন ঐ দ্বিতীয় রাজ্যে। প্রথমটা মিস্টিক কাব্যের, দর্শনের উদ্ভব স্থল। দ্বিতীয়টা spiritual বা আধ্যাত্মিক কাব্যের। মিস্টিক কাব্য অনেকটা ব্যক্তিগত রহস্যাচ্ছন্ন, প্রাইভেট। আধ্যাত্মিক কাব্য বেশি পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বজাগতিক। অবশ্য দু'টি এলাকা প্রায়ই মিশিয়ে যেতে চায় পরস্পরের সঙ্গে।

এই ভূমিকাটুকু না করলে বিবেকানন্দের স্বল্পসংখ্যক কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট এই শ্রেণীর কবিতাগুলির নায্য মূল্য প্রতিষ্ঠিত করা যেত না।

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের নিজেরই কথা কিছু তুলে দেওয়া যেতে পারে।

"প্রাচীন উপনিষদ্‌সমূহ অতি উচ্চস্তরের কবিত্বপূর্ণ। এইসব উপনিষদ্‌স্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন মহাকবি। তোমাদের অবশ্যই প্লেটোর কথা মনে আছে, কবিত্বের মধ্য দিয়েও জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হয়।"

"উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, ওই ভাষা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝপথে গিয়ে থেমে গেল। কেবল এক অতীন্দ্রিয় সত্তাকে উদ্দেশে দেখিয়ে দিল। তবু সেই সত্তা সম্বন্ধে তোমার অসংশয় উপলব্ধি হল।"

"জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার আর চেষ্টা রইল না!· · আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হল যে, সেই শব্দগুলি উচ্চারণমাত্রেই এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়রাজ্যে অগ্রসর করে দেয়।"

স্বাধীন প্রেরণায় এইরকমের কবিতাই লেখার চেষ্টা করেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর শিব পুতুলমাত্র নয়।

যাঁরা শিবের জীবন্ত সত্যের উপলব্ধি পান—তা সে স্বদেশে বিদেশে যে নামরূপ প্রত্যয়ের মাধ্যমেই হোক না কেন—তাঁদের দর্শনের মধ্যেও থাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব, দর্শন মনন রসক্ষারণের অনন্যস্বাতন্ত্র্য। ল্যাটিন কবি Boethius এই তারকাখচিত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে পৃথিবীতে অবিচল শান্তি বর্ষণ করতে বলছেন—

Rapidos rector comprime fluctus
Et quo caelum regis immensum
Firma stabiles foedere terras.

'হে শাস্তা, এই সব দ্রুত ঢেউকে দমন করো, যে নিয়মে তুমি অপরিমাণ স্বর্গরাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করো, তারই প্রয়োগে এই পৃথিবীকেও করো অবিচল শান্ত।'

বোএথিউস্‌এর এই জীবন্ত ইমেজ্, এই রূপবিগ্রহ—এ শঙ্করের সেই সর্বউপলব্ধিমুক্ত শিব নয়—মানুষ নিজেকে প্রকৃতির সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত করলে যাঁর চিদানন্দরূপের সমকক্ষতা লাভ করতে পারে—

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভ মোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ,
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষম্
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।

বিবেকানন্দ এই স্তবটিকে বিশেষ পছন্দ করতেন এবং ইংরাজি কবিতায় এর অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া শিবের মধ্যে একেবারে কৈবল্য বা শূন্যগর্ভ আনন্ত্য—the vacant infiniteএর স্পর্শও মিলতে পারে, যেমন দেখি শঙ্করএর 'শিবঃ কেবলোঽহম্' কবিতায়। শ্রীঅরবিন্দের শিবের বিভিন্ন রূপের উপর লেখা কয়েকটি কবিতা আছে, যথা— Shiva, Adwaita, The World Game প্রভৃতি।

এখন, বিবেকানন্দের শিব, তাঁর বহুবিদিত নির্বাণ নির্বিকল্প-অনুরাগ সত্ত্বেও, ঐ বোএথিউসএর সৃষ্টিনিয়ামক দেবতার মত। শ্রীঅরবিন্দের সনেটের ঐ অদ্বৈতের ভাবঘন রূপ নয়, বরং তাঁর Shiva কবিতায় একাকিত্বের মধ্য থেকে হঠাৎ উমার মুখের দিকে চেয়ে দেখা শিব। এই শিবেরই উপস্থিতি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের নটরাজে। অবশ্য কবির নিজস্ব দৃষ্টি হিসাবে প্রকাশের পার্থক্য আছে। এই সংস্কৃত স্তবে আমরা বিবেকানন্দকে কবি হিসাবেই পেয়েছি। শুধু সাধক হিসাবে নয়। এই শিবকে তিনি তাঁর শান্তরূপেও আবাহন করছেন, আবার তাঁরই মধ্যে যে অশান্তির আন্দোলন তাকেও স্বাগত জানিয়েছেন। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'তোমার কাছে শান্তি চাব না'।

'পূর্বসংস্কার সব ঝড়ের মত বইছে, ঘূর্ণি ঢেউ উঠে যেন ( জীবনের ) শক্তিগুলিকে আন্দোলিত বিপর্যস্ত করছে; তুমি আমি এই যুগ্ম অস্তিত্বের প্রত্যয়ও নড়ে যাচ্ছে; শিবের মধ্যে থেকেও চিত্তের এই যে অতিবিকল রূপ তার বন্দনা গাই'—

বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্মিমালা।
প্রচলিত খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎ প্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্।

'আবার তিমিরজাল যিনি ছেদন করে শুভ্র তেজ প্রকাশ করেন, শ্বেতকমলের মত যাঁর শোভা, যাঁর পুঞ্জীভূত জ্ঞান অট্টহাসির মত [ কালিদাসের উপমা মনে করিয়ে দেয় ], সংযমীদের হৃদয়ে ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্তব্য সেই নিষ্কল মানস-রাজহংস এই প্রণত আমাকে রক্ষা করুন।'

গলিততিমির মাল শুভ্রতেজঃ প্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ
যমিজন হৃদিগম্যঃ নিষ্কলো ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ

এ শিব কৈবল্য পরিহার করে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'কালের অধীশ্বরের' যিনি

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

এই 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়'কে বারম্বার বন্দনা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

এইবার আমরা বিবেকানন্দের যে ছ'টি কবিতার আলোচনা করব নিজগুণে তারা বিশ্বকাব্যে স্থান পাবার উপযুক্ত। যদি আমরা এমারসনএর Brahmaকে স্থান দিই, তবে বিবেকানন্দের Kali the Motherকে তার চেয়েও মর্যাদার স্থান দিতে হবে। যদি আমরা ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের Passage to India কবিতার নীচে উদ্ধৃত ছত্রে উদ্দীপনা অনুভব করি তবে বিবেকানন্দের The Song of the Sanyasinকে স্থায়ী স্থান দিতে দ্বিধা করবার কথা নয়।

Greater than stars or suns,
Bounding O soul thou journeyest forth,
What love than thine or ours could wider amplify?
What aspiration, wishes, outvie thine and ours,
O soul?
What dreams of the ideal? What plans of purity
perfection, strength?
What cheerful willingness for others' sake to give up all?
For others' sake to suffer all?
...
Passage to more than India!

The Song of the Sanyasinই প্রথমে দেখা যাক। এর মধ্যে বৈরাগ্যভাব ও নিম্নপ্রকৃতি সাংসারিক সংস্কার সম্পর্ক ইত্যাদি বর্জনের কঠোরতা প্রায় শঙ্করাচার্যের সমগোত্রীয়। কিন্তু কবিতাটি নেতিবাচক নয়, সন্ন্যাসীর এবং তার মধ্য দিয়ে মানব-আত্মার উদারমুক্ত স্বরূপের জয়গান। শঙ্করের মত এতে নারীর মায়া ত্যাগের কথা আছে, জীবনের ভোগ তৃষ্ণা সম্পূর্ণ দূর করে দেবার প্রস্তাব আছে। আবার বুদ্ধদেবের প্রেরণা দেখা যায় সম্পূর্ণ অনাগরিক হয়ে একলা ঘুরে বেড়াবার স্বাচ্ছন্দ্য কল্পনায়।

Have thou no home? What home can hold thee, friend?
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble self
Which knows itself. Like rolling river free
Thou ever be, Sanyasin bold! say— 'Om tat sat, om'!

স্বত্তনিপটে বুদ্ধের উপদেশ হচ্ছে : 'ঘুরে বেড়াও সঙ্গিহীন একলা, গণ্ডারের মত'।

সর্বথা স্বাধীন, বিরোধ নেই কারু সঙ্গে,
যা কিছুই জুটুক তাইতেই সন্তুষ্ট,
বিপদ সহ্য করে বিনাক্ষোভে
ঘুরে বেড়াও একলা— গণ্ডারের মত।

কিন্তু আইডিয়ার দিক থেকে যে মিলই থাকুক, কাব্যপ্রেরণার দিক থেকে এ কবিতায় বেজে উঠেছে 'নেতি' নয় 'ইতি' ধ্বনি— 'everlasting yea'! এর কৃচ্ছ্রসাধনও শঙ্করের 'সুরমন্দির— তরুমূল নিবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনংবাসঃ' র মত হলেও তার চেয়ে উদার আনন্দের বার্তাবাহক ; বিবেকানন্দের 'The sky thy roof, the grass thy bed' এ Stevensonএর 'the sky over head', রবীন্দ্রনাথের 'শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান'এর আমেজ।

আসলে এই সন্ন্যাসী এক অদ্ভুত রসায়নে সন্ন্যাসীর শুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ওমর খৈয়মের আনন্দমদিরা। এক চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখছেন—"আমি এতদিনে দু-একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে, 'ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ'— এ সকল যুক্তি বিচার, বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বরের বাইরে— ওসব হতে অনেক দূরে। ওহে 'সাকি' পেয়ালা পূর্ণ কর— আমরা প্রেমমদিরা পান ক রে পাগল হয়ে যাই।"

তুলনা করে দেখা যাক Fitzeraldএর ওমর কবিতা থেকে :

Oh, come with old Khayam, and leave the Wise
To talk ; one thing is certain, that Life flies.
...
Ah, filll the cup.

আর বিবেকানন্দের

Few only know the truth, the rest will hate
And laugh at thee great one! but pay no heed,
Go thou, the free from place to place, and help
Them out of darkness, Maya's veil. Without
The fear of pain or search for pleasure, go
Beyond them both, Sanyasin bold! Say—
'Om tat sat, om!'

Kali the Motherএর কাব্যরস গ্রহণ করতে হলে বোঝা দরকার যে এই কালী শুধু একটা ধর্মীয় প্রতীক নয়, একটা esoteric রহস্যকেন্দ্র মাত্র নয়। এ এক বিশ্বগত সত্য যা সকল মানুষের অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে আসা সম্ভব, বিশেষতঃ সেই মহৎ কবিদের যাঁরা জগতের নিগূঢ়তম ব্যাপকতম সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে চান।

কবি Donne এই অদ্ভুত প্রার্থনা জানাচ্ছেন কাকে ?

Batter my heart, three person'd God...
That I may rise, and stand, o'erthrow me
and bend
Your force, to breake, burn and make me new?

এখন এই three-personed God বলতে Donne যাকেই বুঝুন, আসলে তিনি আবাহন করছেন ভগবানের শক্তিরূপকে, কালীকে। Shelley যে West Windকে বলছেন

Wild spirit, which art moving everywhere ;
Destroyer and Preserver ; hear, oh, hear!

যার সামনে শুকনো পাতা উড়ে চলে, যার ভয়ে সমুদ্রতলের গাছপালা ফুলও 'grow grey with fear and tremble and despoil themselves,' সেই 'ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাম্' এই কালী ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীঅরবিন্দ একটি সনেটে— The Cosmic Dance : ( Dance of Krishna, Dance of Kali )— এই সার্বিক তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন। তার অনুবাদ দিচ্ছি :

দুটি নৃত্যছন্দ আছে এই বিশ্বের বিধানে।
সর্বদা আমরা শুনছি সেই কালীপদপাত,
যা দুঃখদৈন্য দুর্দশায় গাঁথে তালে মানে
জীবনের বাজিখেলা, মধুর, নির্ঘাত।
তাতে দারুণ পরীক্ষা আছে গুপ্ত সাধকের,
আছে মৃত্যু-আলিঙ্গন ক্রীড়ামত্ত আত্ম-বীর,
আছে নিয়তির মল্লমঞ্চে সন্ত্রাস দ্বন্দ্বের,
আর ত্যাগ— সেই একপথ কৃপাপদবীর।
রহস্যের চাবি হয় মানুষী ত্রিতাপ,
একটি সূক্ষ্ম সত্যপথে কালমরু পার,
জড়ের কবর থেকে উঠতে আত্মার সাতধাপ :
এই সবই সেই নাটকের আটপৌরে ব্যাপার।
বলো এ বিশ্বে কৃষ্ণের নাচ হবে কোন বেলা ?
সেই ছদ্মবেশ, ভূমানন্দ, হাসি, প্রেমখেলা ?

বিবেকানন্দের কবিতার প্রথম দিককার দুর্যোগ রাত্রি ও ঝড়ের সুর যেন সেই রঘুপতির 'এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী! ওই রোষ-হুহুংকার। অভিশাপ হাঁকি নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ

তিমিররূপিণী'র একই স্বরসপ্তকে, তবে তার সঙ্গে মিলেছে শেলির West Windএর তীব্রোদাত্ত আস্পৃহা। তাতে ছাড়া পেয়েছে বিশ্বের সমস্ত ভয়মূর্তি— প্রকৃতির, প্রাণের। কিন্তু তবু সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ডাকো Come, Mother, Come।

For Terror is Thy name,
Death is in thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er,
Thou 'Time', the All-Destroyer!
Come, O Mother, come!
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.

যে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কালী কৃষ্ণ শিব —তত্ত্বের আলোচনা করছি তা মনে রেখে বলা যায় রবীন্দ্রনাথে কৃষ্ণের মাধুর্য নটরাজ শিবের লীলার প্রকাশ ব্যাপক ও কাব্যসম্পদময়। কালীভাবকল্প ধ্যানের দীর্ঘ বিচিত্র লিরিক আকৃতি ফুটেছে সমস্ত বিসর্জন নাটকে, জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্যের কণ্ঠের মধ্য দিয়ে। মাতৃস্বরূপিণীর, শারদলক্ষ্মীর অতুলনীয় স্তবসঙ্গীত সমৃদ্ধ করেছে তাঁর গানের ভাণ্ডার। রুদ্রের আবাহনও তাঁর আছে বিখ্যাত কবিতায়, গানে। কিন্তু ছলনাময়ী রুদ্রাণীর স্বীকৃতি তেমন নেই। কিন্তু তাঁর শেষের কবিতাগুলিতে দেখা যাবে এই কালী তাঁর সমস্ত পাওনা আদায় করে নিয়েছেন। 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'— পুরোপুরি এই কালীর ধ্যান। এবং তাঁর শেষ বক্তব্য— 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার' বিবেকানন্দের ঐ Who dares misery Love এর সঙ্গে একসুরে বাঁধা।

জীবনের চরম অভিজ্ঞতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের— এবং এঁদের দুজনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটি চমৎকার মিল আছে। সে হচ্ছে অনন্ত শান্তিসমুদ্রে শেষহীন যাত্রার অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ তা প্রকাশ করেছিলেন 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানে। এটি রচিত হয় ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে। তার তিন মাস আগে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন তাঁর The Infinite Adventure সনেট। অবশ্য এটির প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ সালে। এই সনেটে শান্তিপারাবারে অকূলযাত্রাও আছে— 'On the waters of a namelerss Infinite my skiff is launched' আবার কর্ণধারও আছে— An unseen hand controls my rudder. এমনকি শেষ 'পায় যেন অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার' এর সঙ্গেও একসুরে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—'I shall be merged in the Lonely and Unique,/And wake into a sudden blaze of God'.

এই ধরণের অভিজ্ঞতার কথাই Shelley লিখেছেন তাঁর Adonaisএ প্রায় একই ভাবচিত্রের সাহায্যে :

The breath whose might I have invoked in song
Descends on me ; my spirit's bark is driven,
Far from the shore, far from the trembling throng
Whose sails were never to the tempest given ;
The massy earth and sphered skies are riven,
I am borne darkly, fearfully, afar,
Whilst, burning through the inmost veil of Heaven,
The soul of Adonais, like a star,
Beacons from the abode where the Eternal are.

Adonaisএর এই শেষ স্তবকে শেলি যে যাত্রার কথা বলছেন তা কিন্তু শান্ত' নয়, এও এক চরম adventure, এক দুরন্ত অভিসার, ঝড়ের কাছে নৌকোর পাল সমর্পণ। মেজাজে এর সুর Ode to West Wind এর সমগোত্র। এ যেন নদীর মোহানার তীব্রস্রোতে নৌকা ভাসিয়ে সমুদ্রসঙ্গমের আশায় স্পন্দিত হৃদয়ে অপেক্ষা করা। তবে এ যাত্রা নিরুদ্দেশ নয়, এর সামনে আছে তারার পথনির্দেশ, আর গন্তব্য হচ্ছে সেই চিরন্তন ধাম 'where the eternal are'। শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই কবিতা কিন্তু সম্পূর্ণ সেই চিরন্তন শান্তিসমুদ্রের অন্তরঙ্গ অনুভূতির উপরেই রচিত।

১৮৯৯ সালে নিউইয়র্কে বিবেকানন্দ শেলির Skylarkএর ছন্দে লেখেন Peace বলে একটি কবিতা।

It is death between two lines,
And hill between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

কিন্তু এই শূন্যগর্ভ শান্তিতে তাঁর আশা মিটছেনা। ১৯০০ সালে জানুয়ারি মাসে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তিনি লিখছেন, "যে শান্তি ও বিশ্রাম খুঁজছি, তা আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের— অন্ততঃ আমার স্বদেশের— কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন।"

ঐ বৎসরই পরে আবার লিখছেন :

"হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। সময়ে সময়ে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তিসমুদ্র— মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করছে না।"

"যাই ! মা যাই !— তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, নেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে— অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই।"

যে আত্মিক কাব্যিক অভিজ্ঞতা ধরা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের কাছে ১৯৩৯ সালে, সেই একই অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দের সাধনোত্তীর্ণ আত্মা ও কবিহৃদয়কে পুরস্কৃত করেছিল এই শতাব্দীর প্রথমেই, ১৯০০

সালের এপ্রিল মাসে, সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায়। রীতিমত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় অবশ্য তিনি তা লিখে যেতে পারেন নি ; কিন্তু তার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন চিঠির ঐ গদ্যছন্দে।

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে পাশ্চাত্ত্য দেশে দ্বন্দ্ব চলেছে ধর্মের সঙ্গে ইহজাগতিকতার। এই religious আর secular মনোভঙ্গীর মধ্যে পশ্চিম রায় দিয়েছে secularএর সপক্ষে, কাজেই রাজনীতিতে শিক্ষায় সাহিত্যে সেই হল তাদের প্রেক্ষিত সীমা। আমাদের জীবনেও এরই প্রভাব সুস্পষ্ট। তার কিছুটা সুফল যে ফলে নি এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে তা বলছি না। কিন্তু কিছুটা নিজস্ব সম্পদ আমরা হারিয়েছি। এবং 'পরা' ও 'অপরা'র মধ্যে এই 'অর্দ্ধং ত্যজন্তি পণ্ডিতাঃ' নীতি— যা শুধু আপৎকালীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়— চালিয়ে গেলে মানবসভ্যতা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও হয়ে থাকবে ক্ষীণ। বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের প্রথম কবিকণ্ঠ যা জগৎএর পূর্ব পশ্চিমকে ধ্বনিত ক'রে আবার এনে দিয়েছে জীবন্ত এবং গভীরতম অধ্যাত্মরস— যা সমস্ত ভেদাভেদের নিম্নগুল্মের উপর প্রসারিত হয়েছে সর্বজনগ্রাহ্য ভোরের আলোর মত। বিবেকানন্দের এই ভাবপ্রবাহ কেমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য জগতের অনেক ভাবগ্রাহী চিত্তে তার একটি চমৎকার প্রমাণ নিবেদিতার *Kali the Mother* গ্রন্থ। তার এক জায়গায় নিবেদিতা লিখছেন, "কালী-বিগ্রহ শুধু এক দেবীর মূর্তন চেষ্টা ততটা নয়, বরং একে বলতে পারি আমাদের জীবনের গোপন রহস্যের উচ্চারণ।"

আর-এক জায়গায় : "কালী নীলবর্ণা। প্রায় কালো ; যেন একটা বিরাট ছায়া ; জীবন ও মৃত্যুর নিষ্করুণ সত্যের মত নগ্ন। কিন্তু তার ( আত্মার ) কাছে এ শুধু একটা ছায়ামূর্তি নয়। এই ভয়ঙ্করীর গভীরতম অন্তস্তলে পৌছোয় তার অবিচল দৃষ্টি আর চেনার আনন্দোচ্ছ্বাসে সে তাকে ডাক দিয়ে বলে ওঠে : 'মা' !"

# রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫-১৯৪৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্তমান দশকে এ পর্যন্ত বহু বঙ্গ মনীষীর শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সর্বত্যাগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবিনাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। এই বৎসর সাংবাদিক-প্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েরও শততম জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হইবে ও তাঁহার কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব। সাংবাদিক-রূপেই সাধারণ্যে রামানন্দের প্রসিদ্ধি এবং তিনি ভারতবর্ষে এই বিভাগে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। কিন্তু সাংবাদিক বলিলেই তাঁহার সম্যক পরিচয় হয় না ; রামানন্দ ছিলেন একাধারে চিন্তানায়ক ও কর্মবীর।

রামানন্দ বাঁকুড়া জেলা শহরে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে ১৮৬৫ সনের ২৮শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বাংলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় চারি টাকা বৃত্তি পান। পরে বাঁকুড়াস্থ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। এখান হইতে তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কুড়ি টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। এই দুই স্কুলে অধ্যায়নকালেই রামানন্দের মনে স্বদেশ-প্রেমের বীজ উপ্ত হয়। তিনি যখন ইংরেজি স্কুলে উপরের ক্লাসের ছাত্র তখন ব্রাহ্মশিক্ষক কেদারনাথ কুলভী মহাশয়ের উপদেশে নানাবিধ হিতকর্মে রত হইয়াছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন। কুলভী মহাশয়ের মুখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চমৎকার উক্তিগুলি শুনিতেন, এ কারণ তাঁহার মনে পরমহংসদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। প্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের সংস্পর্শে আসিবারও তাঁহার সুযোগ ঘটিল। তাঁহার উপন্যাস পাঠে রামানন্দের মনে স্বদেশপ্রীতি দৃঢ়মূল হইয়া উঠে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রামানন্দ কলিকাতায় আসেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঘটনাচক্রে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিতে হয়। তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দেন। প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইলেন। ইহার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অধ্যাপনায় ও সঙ্গলাভে বিশেষ উদ্দীপিত হন। এবারেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। বি. এ. পরীক্ষা কালে, শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো বিষয়ে পরীক্ষা আর দিলেন না, কেননা তাঁহার ধারণা হয় উহা আশানুরূপ হয় নাই। সিটি কলেজ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজিতে বি. এ. অনার্স পরীক্ষা দেন ও ইহাতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া কলেজ হইতে চল্লিশ টাকা রিপন বৃত্তি পান। কলেজের ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র রামানন্দের কৃতিত্বে স্বতঃই উৎফুল্ল হন। তাঁহার পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষ রামানন্দকে অবেতনে অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত করেন।

কলিকাতায় আসিয়া রামানন্দ আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথের স্টুডেণ্টস্ অ্যাসোশিয়েশনে উদ্দীপনাপূর্ণ

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিয়া এবং আনন্দমোহন-শিবনাথ প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসমাজে যোগ দিয়া স্বদেশের এবং সমাজের উন্নতিপ্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হইলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার নিকট একজন আদর্শ মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং সেবাকার্যে কঠোর পরিশ্রম ও তৎপরতা রামানন্দকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অধ্যাপনা-কালে তিনি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে কার্য করিতে থাকেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র। ইণ্ডিয়ান মিররেও সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন। রামানন্দ ছিলেন সব্যসাচী। ইংরেজির মতো বাংলা 'সঞ্জীবনী' এবং 'ধর্মবন্ধু'তেও তিনি প্রবন্ধ, রসরচনা ও মন্তব্যাদি সমানে লিখিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ধর্মবন্ধু'র সম্পাদক হন।

এই সনেই (১৮৯০) রামানন্দ সিটি কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার স্থান হইল প্রথমশ্রেণীতে চতুর্থ। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ১৮৯০ মার্চ হইতে রামানন্দকে মাসিক এক শত টাকা বেতনে কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। শর্ত ছিল যে দুই বৎসর কাল এই বেতনেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই সময়ান্তে তাঁহার রীতিমত বেতনবৃদ্ধি হইতে শুরু হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন এবং ইহার পরে এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার ( কলেজ ) অধ্যক্ষ হইয়া যান। সিটি কলেজে তিনি যখন বেতনভোগী অধ্যাপক হইলেন সেই সময় হইতে সেবামূলক নানা কার্যে তিনি ব্রতী হন। ইহার মধ্যে দাসাশ্রম ও 'দাসী'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাসাশ্রম মফস্বলে প্রতিষ্ঠিত ( ২৯ জুন ১৮৯১ ) হইবার পর যখন হইতে ইহার কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় তুলিয়া আনা হয় প্রায় সেই সময় হইতেই রামানন্দ ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন। প্রথমে দাসাশ্রমের কার্যক্রম দুই ভাগে বিভক্ত হয়।— ১. পতিতা নারীগণের কন্যাদের উদ্ধার ও সেবাকার্যে শিক্ষা; ২. দুঃস্থ নিরাশ্রয় রোগীদের এবং রাস্তা হইতে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অনাথ নারীপুরুষকে একটি স্থানে আশ্রয় দান এবং তাঁহাদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা। প্রথমটির জন্য যে কমিটি হয়, তাহার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ। এই কার্যে আইনগত বাধা থাকায় ইহা অল্পকাল পরেই উঠিয়া যায়। দাসাশ্রমের অন্য কার্যের জন্য ১৮৯২, ২৫শে জানুয়ারি একটি সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সেবালয়ের কার্যনির্বাহকল্পে যে কমিটি গঠিত হইল তাহার সভাপতি ছিলেন রামানন্দ স্বয়ং। দাসাশ্রমের মুখপত্র 'দাসী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৯৮ আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথমাবধি রামানন্দ এই পত্রিকাখানি পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার লন। সেবাব্রতমূলক নানা ঘটনা কাহিনী ও সেবাব্রতীদের জীবনী ইহাতে প্রথমে প্রকাশিত হইতে থাকিলেও ক্রমে ইহাকে সাধারণ পাঠোপযোগী করিয়া তোলা আবশ্যক বিবেচিত হয়; আর ইহাতে সে সময়ে খ্যাতিমান প্রবীণ ও নবীন লেখকেরা রচনা পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন। কবিতা গল্প উপন্যাসও ইহাতে স্থান পাইত। সম্পাদকরূপে রামানন্দ বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধনিবন্ধ লিখিয়াছিলেন— তন্মধ্যে অন্ধদের শিক্ষা বিষয়ক ব্রেল পদ্ধতি আলোচনা, প্রাদেশিক কথিত বাংলা, ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা প্রভৃতি রচনা ঐ সময়ে বিশেষ চিন্তার খোরাক যোগায়। এলাহাবাদে যাইবার পরেও রামানন্দ কিছুকাল ইহার সম্পাদনা করেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক অধ্যায় দাসীতেই প্রথম সন্নিবেশিত হইতে থাকে। এই নামটির সঙ্গে বাঙালি পাঠক-সাধারণ প্রবাসীর মারফত আজ সুপরিচিত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিধুশেখর শাস্ত্রী-সহ রামানন্দ। শান্তিনিকেতনে উৎসবসভায়

শিশুশিক্ষার প্রতি রামানন্দের বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি ইতিপূর্বে নূতন ধরণের সচিত্র বর্ণপরিচয় (দুই খণ্ডে) প্রকাশ করেন। ১৩০৮ সালের একটি বিজ্ঞাপনে দেখি তখন পর্যন্ত ইহা এক লক্ষ দুই হাজার বিক্রয় হইয়াছে। শিশু ও কিশোর পাঠোপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশে তিনি ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই উদ্যোগের ফল 'মুকুল' নামক সচিত্র কিশোর পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় আষাঢ় ১৩০২ বঙ্গাব্দে এবং সম্পাদক হন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

রামানন্দ ১৮৯৫ অক্টোবর মাসের প্রথমে সপরিবারে এলাহাবাদ যান এবং কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষতা-কর্মে লিপ্ত হন। ছাত্রদের পাঠোৎকর্ষ ও চিত্তোৎকর্ষ দুইই ছিল রামানন্দের কাম্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি কায়স্থ পাঠশালাকে একটি আদর্শ কলেজে রূপায়িত করিতে ব্রতী হইলেন। কিন্তু কলেজী শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষারও উন্নতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঐ সময়ে নিম্নস্তরের শিক্ষা খুবই বাধাগ্রস্ত ছিল। তৃতীয় পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীতে পর পর সরকারী বিভাগীয় পরীক্ষা লওয়া হইত। এইসকল বেড়া ডিঙাইয়া তবে ছেলেরা প্রবেশিকার মান পর্যন্ত পৌছিতে পারিত। শিক্ষাবিদ্ রামানন্দ এই সমুদয় কৃত্রিম বাধার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইহাতে ফল হইল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার ক্রমে এই বাধাগুলি একে একে তুলিয়া লন এবং ছেলেরা বিনা ক্লেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান পর্যন্ত উঠিতে পারে। কলেজী-শিক্ষাও এইরূপে ব্যাপকতর হইবার পথ পাইল। এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায় বলেন, 'আজ এই প্রদেশে যে শিক্ষার বহুল বিস্তার ঘটিয়াছে, তাহার মূলে ছিল রামানন্দ বাবুর পরিশ্রম ও চেষ্টা।' বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় রামানন্দকে ইহার অন্যতম ফেলো নিযুক্ত করিলেন। কংগ্রেসের শিক্ষাবিষয়ক কমিটি ও শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাদিতে তাঁহার যোগদানের আহ্বান আসিত।

এলাহাবাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সাহিত্যবিষয়ক ও জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্রমে তাঁহার নিবিড় যোগ সাধিত হয়। ঐ প্রদেশে মাদকদ্রব্য-নিবারক সভার সভাপতি, এলাহাবাদস্থ অনাথ আশ্রমের সম্পাদক, প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সদস্য, প্রয়াগ সাহিত্যমন্দিরের সহ-সভাপতি, প্লেগ-আক্রান্ত রোগীদের সেবাকার্যের উদ্যোক্তা, প্রয়াগ বাঙালি সম্মিলনের প্রধান নেতা প্রভৃতি ব্যপদেশে বাঙালি ও অবাঙালি নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি একান্ত ভাবে মিলিত হইলেন। কংগ্রেসের কার্যে তিনি বন্ধুরূপে পান পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে। এলাহাবাদ হইতে প্রতিবার কংগ্রেসে ডেলিগেট বা প্রতিনিধি মনোনীত হইতে লাগিলেন এবং ইহার প্রায় সব অধিবেশনেই তিনি যাইতেন। এলাহাবাদ অবস্থানকালে রামানন্দের মননশীলতা ও কর্মশক্তি বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়া স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। তিনি জ্ঞানতপস্বী কিন্তু অর্জিত জ্ঞান সাধারণের মধ্যে বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শিশুদের জন্য এই সময়ে তিনি দুইখানি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক লেখেন। কলেজের কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি মাসিকপত্র কায়স্থ সমাচারের তিনি প্রথম সম্পাদক হন। এক বৎসরকাল (জুলাই ১৮৯৯-জুন ১৯০০) রামানন্দ এই গুরু দায়িত্বভার বহন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সময়কার তাঁহার একটি প্রধান কার্য হইল 'প্রদীপ' নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। কলিকাতা হইতে ১৩০৪ সালের পৌষ মাসে এই পত্রিকাখানি বাহির হয় এবং রামানন্দ ইহা এলাহাবাদে বসিয়াই সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালের গুণী জ্ঞানী খ্যাতনামা লেখকবর্গ এবং উদীয়মান

সাহিত্যিকগণের রচনাসম্ভারে 'প্রদীপ' পরিপুষ্ট হইত। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা ও কিছু গদ্য রচনা রামানন্দ এই প্রথম প্রদীপে প্রকাশিত করিলেন। পত্রিকাখানির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রায় প্রতি সংখ্যায় বাঙালি অবাঙালি এবং ভারতপ্রেমিক বিদেশী মহামনা মনীষীদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ। বাঙালি যে ভীরু কাপুরুষ শ্রমবিমুখ নহে, তাহারা যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের যথেষ্ট প্রমাণ পূর্বে দিয়াছিল এখনও দিতে পারে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রামানন্দ বীর যোদ্ধা প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিত্র জীবনী প্রথম সংখ্যায়ই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নির্বন্ধাতিশয়ে দূর ও নিকট অতীতের বাঙালির বীরত্বের কাহিনী ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ধারাবাহিকরূপে লেখেন। ইহা ব্যতীত ভাষাতত্ত্ব প্রাণীবিদ্যা রসায়ন জ্যোতির্বিদ্যা স্ত্রী-শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা বাংলায় স্টেনোগ্রাফি হাফটোন ব্লক সমসাময়িক রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র হইল 'প্রদীপ'। বস্তুতঃ অনতিকালের মধ্যেই যে সর্ববিধ বিদ্যার আলোচনা ও জাতীয় সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চিন্তার একখানি প্রথমশ্রেণীর মাসিক পত্রের অভ্যুদয় হইবে 'প্রদীপ' তাহার আগমনী বাঙালিকে শুনাইল।

রামানন্দ প্রায়ই পাণিনি কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য এলাহাবাদবাসী বাঙালি মনীষীদের সঙ্গে বাঙালির, বিশেষ করিয়া প্রবাসী বাঙালির, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনায় লিপ্ত হইতেন। এইসকল আলোচনার ফলে একখানি উৎকৃষ্ট ধরণের মাসিক পত্র প্রকাশের কথা তাঁহার মনে উদয় হইয়া থাকিবে। পরবর্তী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বীজও আমরা ইহার মধ্যে পাই। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে রামানন্দ এলাহাবাদ হইতে 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন। প্রবাস হইতে প্রকাশিত, এই জন্যই ইহার এইরূপ নামকরণ। রামানন্দ পত্রিকাখানিকে প্রবাসী বাঙালির একেবারে মুখপত্র করিয়া তুলিলেন না বটে, কিন্তু ইহাতে ক্রমে ক্রমে প্রবাসী বাঙালিদের নানা সমস্যা ও সাধনার কথা প্রকাশিত হয় এবং এজন্য তাঁহারা এখানিকে তাঁহাদের নিজস্ব পত্রিকা বলিয়াই জ্ঞান করিতে থাকেন। এ বিষয়ে তৎকালীন জয়পুরপ্রবাসিনী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কয়েকটি কথা উল্লেখ করি। "…প্রবাসী মানুষের কাছে 'প্রবাসী'র সমাদরের অবধি রইল না। প্রবাসের শিক্ষিত প্রবাসী বাঙালিদের কাছে প্রবাসী যেন গৃহপঞ্জিকার মতো অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল— অবশ্য-পাঠ্য তো বটেই। তাঁদের মনে ও জীবনে সাহিত্যের একটি শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন আনন্দময় পরিবেশ প্রবাসী সৃষ্টি করেছিল।"[১]

'প্রবাসী' কিন্তু কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মুখপত্র না হইয়া এবং কোনো একক বিদ্যার আলোচনা-ক্ষেত্র না হইয়া সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের এবং সকল বিদ্যার প্রতিভূ হইল। এই কারণে ইহা ত্বরায় বাঙালি ও প্রবাসীবাঙালি নির্বিশেষে সকল বাংলাভাষীরই নিকট আদরণীয় হইয়া উঠিল। বিবিধ জাতীয় সমস্যা, বিবিধ বিদ্যা যেমন শিল্পকলা কারুশিল্প কবিতা রসরচনা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ইতিহাস ভাষা সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক রচনার দ্বারা এবং চিত্রসম্ভারে এখানি সমৃদ্ধ হয়। সাধারণের নিকট ইহা এতই সমাদৃত হয় যে প্রচারসংখ্যা শীঘ্রই বিস্তর বাড়িয়া গেল। প্রদীপের ন্যায় প্রবাসীতেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ মনস্বী লেখকবর্গ লেখা পরিবেশন করিতে থাকেন। তবে প্রথম দিকে প্রবাসী-বাঙালি সাহিত্যিকদের লেখার দ্বারাই ইহার কলেবর বেশির ভাগ পূর্ণ হইত।

১ প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিক, পৃ. ১৮

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'প্রবাসী' একটি বিষয়ে সাময়িক সাহিত্যে পথ প্রদর্শক হইল। প্রচুর অর্থব্যয়ে ও নানাবিধ আয়াস স্বীকার করিয়া রামানন্দ দ্বিতীয় বর্ষ হইতে দেশী বিদেশী রঙীন চিত্র সর্বপ্রথম প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের রঙীন চিত্রসমূহও ক্রমান্বয়ে ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। নব্য চিত্রকলা ( যাহা ভারতীয় চিত্রকলা নামে অধুনা পরিচিত ) প্রচারে ও প্রসারে প্রবাসীর কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। নন্দলাল বসু অসিতকুমার হালদার সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত সারদাচরণ উকিল মুকুল দে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অবনীন্দ্র-শিষ্যপ্রশিষ্যগণের চিত্র ধারাবাহিক ভাবে বাহির করিয়া 'প্রবাসী' জনসাধারণকে শিল্পসচেতন করিয়া তোলে। ভারতীয় শিল্পকলার ইহা একটি যুগান্তকারী প্রয়াস।

রামানন্দ কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। কংগ্রেস কর্তৃক ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করিবার সার্থক প্রচেষ্টার কথা তিনি বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানেই এবং যখনই ঐক্যবুদ্ধি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াছেন তখনই তিনি ইহার প্রতিবাদকল্পে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি চিন্তাশীল নীরব কর্মী। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি আর অন্তরালে থাকিতে পারেন নাই। ১৩১২, ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন এলাহাবাদে বসিয়া প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে বিবিধ উপায়ে স্বদেশী-ব্রত উদ্‌যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। অরন্ধন রাখিবন্ধন যথারীতি প্রতিপালিত হইল। তিনি প্রকাশ্য সভাসমিতিতেও সভাপতি বা প্রধান বক্তারূপে যোগ দিয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। বহু বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিবারে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হয়। তিনি জনসাধারণের সম্মুখে স্বদেশীর মূর্ত প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইলেন। 'প্রবাসী'কেও রামানন্দ স্বদেশী-আন্দোলন-সঞ্জাত বিবিধ প্রচেষ্টার আলোচনার ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষানীতি প্রভৃতি ইহাতে বিশেষ-ভাবে স্থান পাইতে লাগিল। তবে রামানন্দের স্বদেশীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যাপকতর, স্বদেশীয় আচার্য বসুর অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীপ্রধানদের শিল্পকলার প্রকাশ প্রভৃতিও ইহার অঙ্গীভূত করিলেন। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় চিত্রকলার বিচার-বিশ্লেষণে ভগিনী নিবেদিতা বিশেষ তৎপর ছিলেন। ভারতীয় মহাজাতি গঠনে শিল্পের শক্তিমত্তা ও প্রাণপ্রাচুর্য যে কত কার্যকরী তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই রামানন্দের মনে একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কথা উদয় হয়। বাঙালির সমস্যা ভারতবাসীর সমস্যা—এককথায় বাঙলা তথা ভারতের মর্মবাণী স্বদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে প্রচার হেতু এবং ব্রিটিশ সরকার ও বিশ্ববাসীর নিকট ইহা পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত এইরূপ একখানি ইংরেজি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। রামানন্দ স্বেচ্ছায় এই ভার লইতে আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু এই সময়, ১৯০৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ-কর্তৃপক্ষের উপর সরকারি চাপ পড়ার দরুণ কলেজের স্বার্থরক্ষা করার জন্য তাঁহাকে অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিতে হইল। প্রবাসী তখনও ঋণমুক্ত হয় নাই। তাহার উপরে আয় সম্পূর্ণ বন্ধ। এ অবস্থায়ও কিন্তু রামানন্দ সংকল্পচ্যুত হন নাই। তিনি পূর্ব ব্যবস্থা মতো ১৯০৭ সনের জানুয়ারি মাসে অভাব ক্ষতি ও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলেন। নাম দিলেন ***The Modern Review and Miscellany***। তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টাকে ভারতের মনীষীবৃন্দ সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর

হইলেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, রাজনীতি ও সমাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যরসিক, শিল্পী ও শিল্পসমালোচক চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ রচনার দ্বারা মডার্ন রিভিউকে একখানি উন্নত উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্রে পরিণত করিতে সবিশেষ সহায়তা করেন। ইহাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়।

মডার্ন রিভিউ ভারতবর্ষের মুক্তিযজ্ঞে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের জাতীয়তা-বিরোধী অপকৌশল রামানন্দ *Notes* বা সম্পাদকীয় মন্তব্যে ধরাইয়া দিতেন এবং ইহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যখন চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের উদ্ভব হয় ও দুই দলের মতানৈক্য হেতু সুরাটে কংগ্রেস ভাঙিয়া যায় তখন রামানন্দ স্বদেশবাসীদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, জাতীয় নেতা ও কর্মীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকারেরই বলবৃদ্ধি পাইবে। আর, ইহার ফলে আমাদের জাতীয় প্রগতি পদে পদে ব্যাহত হইবে। তাঁহার এই উক্তি অবিলম্বে যথার্থ প্রতিপন্ন হইল। ব্রিটিশ সরকার প্রবল প্রতাপে নির্বিচারে জাতীয় নেতা ও কর্মীদের কারারুদ্ধ করিলেন ও নানারূপ জরুরী আইন বিধিবদ্ধ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের উৎসমূলে আঘাত হানিলেন। রামানন্দ মাসের পর মাস তাহাদের এই কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন অপরাপর প্রদেশেও অনুসৃত হইল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার ইহাতে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহারা কয়েকজন স্বদেশী কর্মীকেই বহিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। রামানন্দের উপরে এই হুমকি দিলেন যে, ঐ অঞ্চল হইতে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইবে। যে প্রেসে মডার্ন রিভিউ ছাপা হইত সেই প্রেসের উপরও সরকারি নির্দেশ আসিল, তার ফলে সেখানে কাগজ ছাপা বন্ধ হইল। রামানন্দ দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। মডার্ণ রিভিউ ১৯০৮ মে সংখ্যা এবং প্রবাসী ১৩১৫ বৈশাখ সংখ্যা কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হইল। রামানন্দ সপরিবারে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতাই অতঃপর তাঁহার কর্মক্ষেত্র হয়।

রামানন্দ সরকারের চিহ্নিত ব্যক্তি। কাজেই কলিকাতায় ফিরিবার পরেও বহু বৎসর যাবত গোয়েন্দা পুলিশ তাঁহার উপর কড়া নজর রাখিতে থাকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গলির একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া সেখানে তাঁহার বাসস্থান ও আপিসঘর নির্দিষ্ট হইল। রবীন্দ্রনাথের গোরা এলাহাবাদে থাকিতেই প্রবাসীতে ( ভাদ্র ১৩১৩ ) প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতায় ফিরিবার পর ১৩১৫ সালে ইহা সমাপ্ত হইল। তাঁহার জীবনস্মৃতিও পরে প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হয়। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে রামানন্দের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন বাংলা মাসিক পত্র হইতে লেখার দরুণ সর্বপ্রথম তিনি প্রবাসীর নিকট হইতেই দক্ষিণা স্বরূপ অর্থ পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরে বিদেশী কাগজপত্র হইতে জ্ঞানগর্ভ অংশগুলি নিজে অনুবাদ করিয়া এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ দ্বারা অনুবাদ করাইয়া 'প্রবাসী'র জন্য পাঠাইতেন। রামানন্দও সাগ্রহে এগুলি নিয়মিত 'সংকলন'রূপে পত্রস্থ করিতেন। ইহা হইতেই প্রবাসীর 'কষ্টিপাথরে'র উৎপত্তি। সারগর্ভ সুচিন্তিত রচনাদি বাদে প্রবাসীর বৈশিষ্ট্য হইয়া দাড়ায়—কষ্টিপাথর, পঞ্চশস্য, দেশের কথা ( পরে দেশবিদেশের কথা ), পারাপারের ঢেউ, মহিলা মজলিস, বেতালের বৈঠক, ছেলেদের পাততাড়ি প্রভৃতি বিভাগগুলি।

ইহার কোনো কোনোটি পরে অন্যান্য পত্রপত্রিকায়ও অনুসৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি যুগান্তকারী রাজনৈতিক প্রবন্ধ, যেমন ছোটো ও বড়, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, সত্যের আহ্বান ইত্যাদি প্রবাসীতে পত্রস্থ হয়।

প্রথম মহাসমরকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের ধরপাকড়ের হিড়িক চলে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাও কেমন যেন তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই সময়ে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ বিভ্রান্ত দেশবাসীর পরম সহায় হইয়া উঠিল। নির্ভীক রামানন্দ সরকারী রোষ অগ্রাহ্য করিয়া জাতির মর্মবেদনা সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং নিজের ও পরের বিবিধ রচনার মধ্য দিয়া দেশবিদেশে জানাইতে ব্রতী হইলেন। তিলক-বেসান্ত পরিচালিত 'হোমরুল'-আন্দোলনকেও রামানন্দ আন্তরিক স্বাগত জানান। তিনি ইহার সমর্থনে মডার্ন রিভিউতে যে সব তথ্যমূলক ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা অপর কোনো কোনো লেখকের এই বিষয়ক রচনার সঙ্গে একত্র করিয়া *Towards Home-Rule* পুস্তকে গ্রথিত করেন।

রামানন্দ একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী, তাই কংগ্রেসের ১৯১০ সনের অধিবেশনে যখন রামসে ম্যাকডোনাল্ডকে সভাপতি করা সাব্যস্ত হয় তখন মডার্ন রিভিউতে ইহার প্রতিবাদ করেন। ১৯১৭ সনে অ্যানি বেসাণ্ট কংগ্রেসের সভাপতি হইবেন, রবীন্দ্রনাথের মুখে যখন এই কথা শুনিলেন তখনও ইহাতে কবিগুরুর সম্মতি সত্ত্বেও তিনি ইহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড বর্জনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাত্র দুইজনের নিকট পরামর্শ যাচ্ঞা করেন। সি. এফ. এণ্ড্রুজ উহা বর্জন না করিতে বলেন। কিন্তু রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবকে পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছিলেন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর পৃষ্ঠায় এই সময়কার অনাচারের কথা বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় দেশবিদেশেও লোকমত অনেকটা ভারতবাসীর অনুকূলে ফিরিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে তাঁহার অত্যল্পসংখ্যক বন্ধুর মধ্যে অন্যতম বলিয়া জানিতেন। তাঁহার মূল রচনা প্রবাসীতে এবং অনেকগুলি কবিতা গল্প প্রবন্ধ ও রসরচনার অনুবাদ (কোনো কোনোটি স্বকৃত) মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত করিয়া রামানন্দ অবাঙালি ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষাভাষী সুধীমণ্ডলীর গোচরে আনিবার প্রভূত আয়োজন করেন। ইহা নোবল পুরস্কার (১৯১৩)-প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও পরে বিশ্বভারতীর সঙ্গেও রামানন্দের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিল, বিশ্বভারতী কলেজের তিনিই হইলেন প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ। রামানন্দ প্রস্তাব করেন যে বিলাতের হোম ইউনিভার্সিটি সিরিজ বা গ্রন্থমালার মতো বিশ্বভারতী কর্তৃকও একপ্রস্থ লোকশিক্ষার উপযোগী বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক ছোটো আকারের সুলভ গ্রন্থ-সমূহ প্রকাশ করিলে তাহা সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির খুবই সহায়ক হইবে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দিত হন। অতঃপর বিশ্বভারতী 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ প্রসঙ্গে এখানে আরও কিছু বলি।— রবীন্দ্রজীবনের শেষ কুড়ি বৎসরে রামানন্দ তাঁহার অসংখ্য রচনা— কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস পত্রাবলী ও প্রবন্ধনিবন্ধ প্রবাসীতে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মুক্তধারা, রক্তকরবী, শেষের কবিতা, সভ্যতার সংকট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে *Golden Book of Tagore* সম্পাদনা করিয়া রামানন্দ তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন।

রামানন্দ ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা চাহিতেন, কিন্তু তাহার নিম্নে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ লাভ হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবার কোনো কারণ নাই। এই স্বরাজকেই পরে মহাত্মা গান্ধী Substance of Independence বা স্বাধীনতার সার বলিয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গান্ধীজি কর্তৃক উত্থাপিত ও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয় তখনও রামানন্দ ইহার মূল লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সম্মতি জানান। কিন্তু এই প্রস্তাবের সকল স্তর বা ধাপ তাঁহার সমর্থন পায় নাই। জাতি-গঠনমূলক বা রচনাত্মক সকল কার্যেই রামানন্দ ছিলেন পূর্বাপর অগ্রণী। চরকা ও খদ্দর প্রচলন, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের অনুকূলে পত্রিকা দুই খানিতে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। কবিতায় প্রবন্ধে ও সম্পাদকীয় প্রসঙ্গসমূহ দ্বারা তিনি জাতিকে স্বাবলম্বন-মন্ত্রে ও সংগঠন কার্যে উদ্বোধিত করিতে তৎপর হইলেন। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে, সাহিত্য ক্ষেত্রে বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন যখনই কলুষ দুর্নীতি ধাপ্পাবাজি দায়-সারা-গোছ কাজ দেখিয়াছেন তখনই ইহার বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেন। স্বরাজ্য দলের হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট বা চুক্তিকে তিনি আদৌ বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। ইহা যে পরে দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য অসদ্ভাব ও ভেদবুদ্ধির উদ্রেক করিবে এই সাবধানবাণীও রামানন্দ উচ্চারণ করিলেন। পরবর্তীকালের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর মধ্যে ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘে এ যাবৎ বৃটিশ সরকারের মনোনীত ভারতীয় সদস্যরাই যোগ দিয়াছেন। ভারতবাসীর স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সংঘ-কর্তৃপক্ষের গোচরে একরূপ আনাই হইত না। রাষ্ট্রসংঘ ১৯২৬ সনে সর্বপ্রথম একজন বে-সরকারী ভারতীয়কে ইহার কার্যকলাপ সাক্ষাৎভাবে পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। ইনি হইলেন প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ঐ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভায় যান এবং স্বচক্ষে ইহার কার্যকলাপ দেখিতে চেষ্টা করেন। পাছে নিজ স্বাধীন সত্তা বিঘ্নিত হয় এই আশঙ্কায় রামানন্দ রাষ্ট্রসংঘের নিকট হইতে যাতায়াত খরচ এবং রাহা খরচ বাবদে কিছুই লন নাই, নিজে হইতে সমস্ত ব্যয় বহন করেন। রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় এই কারণেই প্রথমাবধি তাঁহাকে ভালো চক্ষে দেখেন নাই। রামানন্দ উক্ত প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মীবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া এবং পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহাতে মোটেই তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রসংঘের জন্য অর্থব্যয় হয় প্রচুর, কিন্তু ভারতীয় কর্মী খুবই সামান্য। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে ভারতবর্ষ প্রায় বাদ পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা, নারীদের ও শ্রমিকদের অবস্থা প্রভৃতি খাতে ভারতের জন্য অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাদি করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের কোনো যত্ন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তাহাদের ঔদাসীন্য ও অবহেলা প্রকট। রামানন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া রাষ্ট্রসংঘের বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। হয়তো ইহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে এমনটি করা সম্ভব হইত না। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইটালি জার্মানী ফ্রান্স ও ব্রিটেন পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা প্রবাসীতে প্রকাশিত 'সম্পাদকের চিঠি' নামক ধারাবাহিক লেখায় বিধৃত রহিয়াছে। রামানন্দ ইহার পর আর নিরালায় বসিয়া রহিলেন না। তিনি 'সাধারণের মানুষ' (public man) হইয়া

ভারতবাসীর কল্যাণকর নানা উদ্যোগে যোগদানের জন্য যেখান হইতে আমন্ত্রণ আসিয়াছে সেখানেই যাইতে তৎপর হন।

পূর্বে প্রবাসীতে প্রবাসী বাঙালির কথা বিস্তর বাহির হইত। মডার্ণ রিভিউতে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের বিষয় এবং এই জন্য তাঁহার ও তদীয় সহকর্মী নারী পুরুষের অপূর্ব আত্মত্যাগ দুঃসাহসিক কার্যকলাপ ও অশেষ দুঃখবরণ সম্বন্ধে মডার্ন রিভিউতে সচিত্র প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৯২৭ সন নাগাদ বহির্ভারতে প্রবাসী ভারতীয়দের বিষয় রীতিমত আলোচনার নিমিত্তও তিনি ব্যবস্থা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিশাল ভারত নামক হিন্দি মাসিক পত্র তাঁহারই পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক পণ্ডিত বেনারসী দাস চতুর্বেদী *Indians Abroad* নামক মডার্ন রিভিউর একটি অধ্যায়ে বহির্ভারতে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে প্রতিমাসে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধেও ইহাতে বহু লেখা বাহির হইয়াছিল এবং তাহাতে ফলোদয়ও হইয়াছিল।

রামানন্দ শুধু পত্রিকা সম্পাদনা বা পরিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও শিল্পসাহিত্য-শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া একটি উন্নত ধরণের জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হন। এই কার্যে তাঁহাকে কোনো কোনো সময়ে বিপদের সম্মুখীন হইতেও হইয়াছিল। তিনি ১৯২৮ সনে ডক্টর জ্যাবেস. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড লিখিত *India in Bondage* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত করিলেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেই তাঁহার উপর সরকারী কোপ পড়িল। পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হইয়া প্রচার নিষিদ্ধ তো হইলই, উপরন্তু মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে সজনীকান্ত দাস এবং প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারীরূপে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্ত হইলেন। কয়েক সহস্র টাকা জরিমানা করিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

একটু আগেই বলিয়াছি রামানন্দ তখন হইতে সাধারণের মানুষ হইয়াছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সুরাট অধিবেশনে সভাপতি-পদে বৃত করা হইল। সভাপতির অভিভাষণে রামানন্দ দেখাইলেন যে, হিন্দুমহাসভার আদর্শ ও লক্ষ্য জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মের অনুবর্তীদের লইয়াই এই সভা, কাজেই (ব্যাপক অর্থে) হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের ভিতরকার গলদ, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করিয়া ইহাকে সুস্থ সংহত ঐক্যবদ্ধ করাই সভার লক্ষ্য। সভা অপরাপর ধর্মাশ্রয়ীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মিলিত হইতে পারিবে। এই দিক হইতে ইহা একটি অ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানও বটে। রামানন্দ ইহার পরবর্তী কোনো কোনো নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠানেরও সভাপতিত্ব করিয়াছেন,—যেমন অখিল ভারত মিত্র ও করদ রাজ্যের প্রজা সম্মেলন, জাত-পাত-তোড়ক সম্মেলন, সমাজসংস্কার সম্মেলন, একেশ্বরবাদী সম্মেলন প্রভৃতি।

১৯২৯ সন হইতে ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। রামানন্দ ১৯২৯ সনের লাহোর কংগ্রেসে ও ১৯৩১ সনের করাচী কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯৩০), দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯৩২-৩৪), নবোদ্ভূত বিপ্লববাদ (সরকারী পরিভাষায় সন্ত্রাসনবাদ), গোলটেবিল বৈঠক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, ভারত শাসন আইন (১৯৩৫), দ্বিতীয় মহাসমর (১৯৩৯), সীমিত সত্যাগ্রহ (১৯৪০-৪১), ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব (১৯৪২), আগস্ট বিপ্লব (১৯৪২) প্রভৃতি জাতীয়

স্বাধীনতার অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে দায় ঝুঁকি মাথায় লইয়া লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শতাব্দীর প্রথমাবধি ভারতের জাতীয়তা তথা স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ধারাবাহিক ইতিহাসের আকর প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর পৃষ্ঠায় সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে।

বিবিধ সভাসমিতি-সম্মেলনের কথা সামান্যমাত্র বলিয়াছি। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রামানন্দ ছিলেন অন্যতম উদ্‌গাতা এবং প্রতিষ্ঠাবধি ইহার প্রধান প্রতিপোষক। রামানন্দ এই সম্মেলনের প্রায় সকল অধিবেশনেই যোগদান করিতেন— কখনও প্রধান সদস্য ও বক্তা, কখনও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কখনও বা শাখা ও মূল সমিতির সভাপতি রূপে। তাঁহার ভাষণ ও উপদেশ প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। নারী জাতি, অনুন্নত সম্প্রদায়, কৃষক ও শ্রমিক সকলের অবস্থার উন্নতির জন্যই তাঁহার প্রাণস্পর্শী রচনা শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুকরণের যোগ্য। অধ্যাপক কার্ভের পুণা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন-ভাষণে তিনি ভারতীয় নারী সমাজের বিবিধ সমস্যার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারাই একটা জাতি বড় হয় না। তাহার ধনসম্পদ বৃদ্ধি হওয়াও একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানে ব্যাঙ্ক কলকারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতির ধনসম্পদ বৃদ্ধির উপায় হইবে এই জন্য এইসব প্রতিষ্ঠান হইতে যখনই ডাক আসিত রামানন্দ তখনই সানন্দে সাড়া দিতেন। তাঁহার পত্রিকা দুইখানিকে এই ধরণের আলোচনারও বাহন করিয়া লন।

আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্তমান আলোচনা শেষ করিব। রামানন্দ নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী। যখনই এই জাতীয়তাবাদ তথা অখণ্ড ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার কিছুমাত্রও আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তখনই তিনি ইহার বিরুদ্ধে পত্রিকা দুইখানির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কংগ্রেস ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহার লক্ষ্য অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে কংগ্রেস-পরিচালকগণের কার্যক্রমে বৈপরীত্য তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিত। পূর্বেকার হিন্দু-মুসলিম চুক্তি, মি. জিন্নার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা কল্পে প্রস্তাবিত ১৪ দফা দাবী, গোলটেবিল বৈঠকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের যোগসাজসে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত আত্যন্তিক জিদ, প্রধানমন্ত্রী মি. ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা ও তীব্র নিন্দা রামানন্দ পত্রিকার পৃষ্ঠায় করিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে রচিত ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) সম্পর্কে মুসলমানদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত 'না-গ্রহণ না-বর্জন'-নীতি কংগ্রেস অবলম্বন করিয়াছেন তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, নরসিংহ চিন্তামন কেলকার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বিভিন্ন বিভাগের মনীষী-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রামানন্দ মিলিত হইলেন এবং কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের উদ্যোগ করিয়া কংগ্রেসের এই কার্যের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মর্মবেদনা স্বদেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে জানাইলেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ ও স্থলে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতেও রামানন্দ যোগ দিয়া কংগ্রেস-নীতির অদূরদর্শিতা এবং ভাবী কুফলসমূহের বিষয় সম্পর্কে সাধারণকে সাবধান করিয়া দেন। তিনি অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বিভেদের ভিত্তিতে রচিত ভারত শাসন আইন যে একদিন মুসলমান এবং হিন্দুজাতির মধ্যে পুরাপুরি বিচ্ছেদও ঘটাইতে পারে—এরূপ ভাবনায় তাহাকে বিচলিত

করিয়াছিল। সম্প্রদায় বিশেষের আপত্তি হেতু যখন আমাদের 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীতটি ছাঁটাই করিবার প্রস্তাব হয় তখনও রামানন্দ এক প্রতিনিধি-দলের নেতারূপে মহাত্মা গান্ধীর নিকট ইহার অযৌক্তিকতা ব্যক্ত করেন এবং বন্দেমাতরম্ সংগীতটি জাতীয় সংগীতরূপে যে পুরাপুরি গ্রহণ করা উচিত এবিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ়মত জানাইলেন।

রামানন্দ ১৯৪২ সনের শেষ নাগাদ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ক্রমেই বুঝা গেল এই ব্যাধি হইতে তাঁহার আর নিস্তার নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহার বাসস্থানে গিয়া বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, বিশ্বভারতী, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘ, কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ প্রভৃতির পক্ষে মানপত্র দেওয়া হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অল্পসল্প কথায় মানপত্রের উত্তর দেন। ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা পূজারী, চিন্তানায়ক ও কর্মবীর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ ইহধাম ত্যাগ করেন। এরূপ একটি কীর্তিমান জীবনের কথা সামান্যতঃ আলোচনা করিয়াও আমরা আজ ধন্য।

# চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির কয়েকটি অক্ষর

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকায় চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির লিপিকাল ও লিপিবৈশিষ্ট্য[১] সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি ; তবে ঐ বই-এর পঁচিশ পৃষ্ঠায়[২] একটি মন্তব্য আছে—

> পোই এই দুটি অক্ষরের পর একটি আ বার শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে উপরে তুলিয়া দেওয়া আছে।

এই মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে শাস্ত্রীর ধারণা ছিল পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতক। আর এক জায়গায় চর্যার পুথি সম্বন্ধে শাস্ত্রী বলেছেন,[৩]

> ...যে পুথিগুলি [ চর্যা ও দোহার পুথি ] পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান আমলেরও পূর্বে লেখা। পুথিগুলি পাকান তালপাতায় লেখা ; সে তালপাতা প্রায় কাগজের মত। আর অক্ষর সেই সেকালের বাঙ্গালা। পুথিগুলিতে তারিখ নাই। কিন্তু ঐ কালের যে সমস্ত তারিখওয়ালা পুথি আছে তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে।

আরও এক জায়গায় শাস্ত্রী বলেছেন,[৪]

> এ [ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ] পুথির অক্ষরগুলি ১২ শতকের গোড়ার।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চর্যাগীতির পুথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির চেয়ে পুরাণো নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।[৫]

> উহা [ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ] বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ

১. 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র ভূমিকায় লিপিবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা না থাকলেও 'প্রাচীন বাংলা অক্ষর' নামক প্রবন্ধে ( দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভার, ১৯৫৬, পৃ. ৩০১ ) চর্যার পুথির লিপি সম্পর্কে নিম্নউদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

"ইহার 'প' অনেকটা এখনকার 'প'-য়ের মত হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ 'প'-এর টাঙ্গির মত যে মুখ আছে তাহার নীচের রেখাটি 'প'-য়ের দাঁড়িটার তলা পর্যন্ত যায় না, মাঝামাঝি পর্যন্ত যায়।...'ব'-য়ের আর সেরূপ পেট মোটা নাই, পেটটা পড়িয়া গিয়াছে। সব তেকোনা অক্ষরেরই কোনগুলা বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। 'র' 'ব' ঠিক তেকোনা হইয়া উঠিয়াছে। 'ধ'-য়ের মাথায় একটু বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়।"

বিবরণ সংক্ষিপ্ত বটে, তবে চর্যার পুথির লিপি সম্পর্কে এই একমাত্র বিবরণ— পুথির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ— তাই মূল্যবান্।

২. 'বৌদ্ধ গান ও দোহা', প্রথম সংস্করণ, ১৩২৩

৩. 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪১

৪. 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ৩০১

৫. বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৩২৩) গ্রন্থে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল', পৃ. /০

শাস্ত্রী সি. আই. ই কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনাকাল হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থসমূহের যে পুথিগুলি আনাইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন কিনা সন্দেহ।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল "১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে"।[৬] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসংশয় নন্। তিনি একবার বলেছেন লিপিকাল চতুর্দশ শতক[৭], আর একবার বলেছেন পঞ্চদশ শতক[৮]। কোন্‌টি তাঁর আসল মত বলা শক্ত। আসল মত যদি পঞ্চদশ শতক হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যখন, তাঁর অনুমানে, চর্যার চেয়ে পুরাণো তখন চর্যার পুথির লিপিকাল রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ষোড়শ শতকের আগে নয় বলেই বুঝতে হবে।

সুকুমার সেন-এর অনুমান চর্যার পুথি "চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দের মধ্যে অনুলিখিত।"[৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন—এঁদের অনুমান থেকে জানা যাচ্ছে যে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথিখানির লিপিকালের ঊর্ধ্বসীমা দ্বাদশ শতক, নিম্নসীমা ষোড়শ শতক।

## ২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন চর্যার পুথির লিপি বাংলা। তথাপি অনেকের ধারণা পুথিখানির লিপি বাংলা নয়, নেওয়ারী। পুথিতে নেওয়ারী অক্ষরে সংশোধনের চিহ্ন আছে, সে-কথাও শাস্ত্রী বলেছেন; কিন্তু মূল পুথিখানি যে বাংলা অক্ষরে লেখা সে-সম্পর্কে শাস্ত্রীর মনে কোন সংশয় ছিল না। যাঁরা শাস্ত্রীর মন্তব্য না দেখে বা অগ্রাহ্য করে নেওয়ারী অক্ষরের কথা বলেছেন তাঁদের কেউ-ই অবশ্য মূল পুথি চোখে দেখেন নি। সম্ভবত পুথি নেপালে পাওয়া গিয়েছে বলেই নেওয়ারী লিপি এবং নেওয়ার লিপিকারের কথা উঠেছে।

নেওয়ারী অক্ষর বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভবের এবং বিবর্তনের আলাদা কোনো ইতিহাস নেই, তা নাগরী বা বাংলা অক্ষরেরই স্থানীয় প্রকারভেদ। এ-সম্পর্কে Bendall-এর উক্তি[১০] প্রণিধানযোগ্য—

> The Nepalese must not, then, be regarded as a district and original development of the Indian alphabet in the same sense that Bengali, for instance, is so.

প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষর মূলত নাগরী বা বাংলা—এ কথা স্মরণ রেখেও নিঃসংশয়ে বলা চলে যে চর্যার

---

৬. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল', পৃ. ৷৵৹**

৭. "...the script makes it impossible to assign the ms. [**শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**] to any date later than the 14th Century A.D." *The Origin of the Bengali Script*, **১৯১৯ পৃ. ৪**

৮. "...*Krsn-Kirtana* of Candidāsa which is certainly not later than the 15th Century A.D." *The Origin of the Bengali Script* **পৃ. ৮৯**

৯. **'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৫০**

১০. **C. Bendall, *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts*, পৃ. xxvii**

পুথির অক্ষর নেওয়ারী নয়, বাংলা[১১]। নেপালে পাওয়া গেছে বলেই চর্যার পুথির লিপিকর নেওয়ার এবং লিপি নেওয়ারী হবেই এমন অনুমান করবারও কোনো কারণ নেই। বাংলা অক্ষরে লেখা বহু পুথি নেপাল থেকে পাওয়া গেছে। যেমন, বোধিচর্যাবতার, অষ্টশাহ্রিকা, কালচক্রতন্ত্র ইত্যাদি।

এক সময় নেপালে বহু বাঙালির বাস ছিল, তাঁরা বাংলা অক্ষরে পুথিও লিখতেন।[১২] সুতরাং নেপালে বাংলা অক্ষরে বাঙালি লিপিকরের লেখা পুথির অস্তিত্ব অভাবিত ব্যাপার নয়।

আবার, চর্যার পুথি যে নেপালেই লেখা হয়েছে এমন নিশ্চিত প্রমাণ কি পাওয়া গেছে? পুথি যে বাংলা দেশ থেকে নেপালে যায় নি, তার প্রমাণ কি? মুসলমান আক্রমণের সময় বাংলাদেশের বহু পুথি নিরাপদ-স্থান নেপালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—এ কাহিনীকে কিম্বদন্তী মনে করবার কারণ নেই। Bendall বলেছেন,[১৩]

> ...both Dr. Wright and Mr. Hodgeson found in Nepal Mss. actually written in Bengal.

সুতরাং নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চর্যার পুথি নেপালে লেখা হয়েছিল এবং নেওয়ারী লিপিকর লিখেছিলেন—এ ধারণা পরিত্যাজ্য।

৩

চর্যার পুথির লিপিকাল জানা যায় নি বটে তবে তারিখওয়ালা অনেক পুথির অক্ষরের সঙ্গে চর্যার পুথির অক্ষরের মিল আছে। সবচেয়ে বেশি মিল আছে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পঞ্চাকার[১৪] পুথির সঙ্গে।

---

১১. চর্যার পুথির প্রায় সব অক্ষরকেই বাংলা অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়; কোনো কোনো অক্ষরের সঙ্গে নগরী অক্ষরেরও মিল আছে। এই মিল প্রাচীন যুগের বাংলা লিপিতে প্রত্যাশিত। তথাপি প্রাচীন বাংলা লিপি এবং প্রাচীন নাগরীর পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। এই পার্থক্যের কথা Burnell এইভাবে বলেছেন,

> "The last [*Gauḍī* or *Bengali*] is chiefly distinguished from the other types by the way of marking secondary *e* and *o*, which is done by a perpendicular stroke before the consonant in the case of *e*, and by a similar stroke before and another after the consonant in the case of *o*, and this is, very nearly, the actual Bengali system. The other types marks these vowels in the same way as is done by the ordinary Nāgarı Alphabet." A. C. Burnell, *Elements of South Indian Palaeography*, ১৮৭৮ পৃ. ৫৩

১২. 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪২

১৩. Bendall, *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts*, পৃ. xx

১৪. এই পুথির বিবরণ আছে Bendall-এর *Catalogue*-এর ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠায়। পুথির সংখ্যা Add, 1699; পুথিখানি সম্পর্কে Bendall-এর মন্তব্য এই—

> "This number [Add. 1699] Consists of three works and a fragment, written by one scribe, Kāśrīgayākāra, in three successive years (1198-1200 A.D.) in the Bengali character, forming the earliest example of that writing at present found."

এই পুথিখানির Bendall-কৃত লিপি-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য *Journal of the Palaeographical Society (Oriental Series)*, ১৮৭৩-১৮৮৩ পৃঃ

এই পুথিখানির অক্ষর আর চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির অধিকাংশ অক্ষর হুবহু এক তো বটেই, লেখার ধাঁচও এক। নেপালে পাওয়া অধিকাংশ পুথির অক্ষর খাঁড়া খাঁড়া, এই পুথিদুখানির অক্ষরগুলি একটু ডান দিকে হেলানো। লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর নয়, বিশেষত চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির লিপিকরের। অক্ষরের আকারে সমতা নেই। অক্ষরগুলির মধ্যে বেশ অনেকখানি করে ফাঁক আছে। দুখানি পুথি-ই মোটা কলমে লেখা।

এই আলোচনায় পঞ্চাকার এবং চর্যাচর্যবিনিশ্চয়[১৫] পুথির কয়েকটি অক্ষর পাশাপাশি রেখে এদের সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করব এবং আরও কয়েকখানি বাংলা পুথির ( বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ) অক্ষরের সঙ্গে চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির অক্ষরের সাদৃশ্যের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়বে। বিশেষ করে পঞ্চাকার পুথিখানি নির্বাচন করবার কারণ এই—পুথিখানি তারিখওয়ালা এবং চযার পুথির অক্ষরের সঙ্গে এই পুথির অক্ষরগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য।

৪

অক্ষরগুলির আকার পরীক্ষা করবার আগে বাংলা অক্ষরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির নাম ঠিক করে নেওয়া দরকার, নতুবা কোন শব্দ দিয়ে অক্ষরের কোন অংশটি আমি নির্দেশ করেছি তা বোঝা শক্ত হতে পারে।

অনেকগুলি অক্ষরকে বাঁ এবং ডান— এই দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। বাঁ অংশটির গুরুত্বই সর্বাধিক, কারণ বাঁ অংশের গঠনের পরিবর্তনেই অক্ষরের পরিবর্তন। ডান অংশ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাঁড়ি। যেমন, 'ব' অক্ষরটির মাত্রা বাদ দিলে '<' এই কোণাকার অংশটি বাঁ, দাঁড়িটি ডান অংশ। অনেকগুলি অক্ষরে ডান এবং বাঁ-অংশের মধ্যে একটি যোজক-রেখা আছে। 'অ' অক্ষরটির ডান-বাঁ-অংশ এবং "যোজক" আলাদা করে দেখাচ্ছি—

অ

এখানে আধুনিক বাংলার '৩'-এর মত অংশটি বাঁ, দাঁড়িটি ডান অংশ এবং এই দুই অংশের মধ্যবর্তী নিম্নমুখী রেখাটি "যোজক"।

যোজক মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল হতে পারে— অ, অর্ধবৃত্তাকার হতে পারে— অ আবার নিম্নগামীও হতে পারে— অ

অক্ষরের বাঁ অংশ ডান অংশের যে-জায়গায় মিলিত হয় তার নাম "সংযোগ"। সংযোগ উঁচুতে হতে পারে— প, মাঝে হতে পারে য, নীচেয় হতে পারে— ম

এই আলোচনাতেই পরে দেখতে পাওয়া যাবে যে সংযোগের উচ্চ/মধ্য/নীচ অবস্থানের সঙ্গে বাংলা লিপির বিবর্তনের যোগ আছে।

---

১৫. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির ছবি শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-এর সৌজন্যে ব্যবহার করতে পেরেছি।

আধুনিক বাংলার অনেকগুলি অক্ষরের ভিত্তি বাঁ-অংশে সূক্ষ্ম 'কোণ' ‹ এবং ডান অংশে দাঁড়ি। বাঁ অংশের ঈষৎ পরিবর্তন করে অনেকগুলি অক্ষর গঠিত। যেমন,

**থ থ ঘ ম ঝ ধ ব র য ষ**

সুতরাং বাংলা অক্ষরের বাঁ অংশের বিশেষ গুরুত্ব। 'কোণ' সূক্ষ্ম হতে পারে (যেমন উপরের অক্ষরগুলিতে) আবার অর্ধবৃত্তাকার হতে পারে— **থ ঘ**

অনেকগুলি বাংলা অক্ষরে বামাংশ এবং নিম্নাংশ যেমন কোণাকার, তেমনি আরও কতকগুলি অক্ষরের নিম্নাংশ অর্ধবৃত্তাকার—**ত ভ ড জ অ**

সুতরাং এই অক্ষরগুলির নিম্নাংশ বোঝাতে অর্ধবৃত্তাকার আঁকুড়ি কথাটি ব্যবহার করেছি। এ-ছাড়া শাস্ত্রীর ব্যবহৃত 'চৈতন' এবং 'বাড়ী'ও ব্যবহার করেছি।

আধুনিক বাংলার 'ল'-এর বামাংশকে বাঁক বলেছি। 'ল'-এ দুটি বাঁক আছে, 'ন'-তে একটি বাঁক। 'ড'-এর সঙ্গে 'জ'-এর পার্থক্য এই রেখাটিতে -একেও 'কোণ' বলা যেতে পারে। তবে আমি একে 'বাহু' বলেছি।

৫

**স্বরবর্ণ : আদ্যাক্ষরে : অ**

নবম শতকের মাঝামাঝি সময় লেখা (৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) পারমেশ্বরতন্ত্র[১৬] নামে একখানি পুথিতে দেখা যায় 'অ'-এর বামাংশটির একাধিক ভাগ ছিল। উপরের ভাগে ছোটো একটি ত্রিভুজ, নীচে অর্ধবৃত্তাকার আঁকুড়ি এই দুটি ভাগকে যুক্ত করেছে মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল 'যোজক'

পঞ্চাকার-এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, নবম শতকের 'অ' ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে (তুলনীয় পঞ্চাকার (১১৯৯) পুথির 'অ') অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। বামাংশের উপরিভাগের ত্রিভুজটি লুপ্ত প্রায়, লুপ্তচিহ্নস্বরূপ মাত্রা থেকে একটি ছোটো রেখা নীচে নেমে এসে আঁকুড়ির মাথার উপর বসেছে। আঁকুড়িটি নবম শতকে ক্ষীণকায় ছিল, ত্রয়োদশ শতকে আকার বিস্ফারিত হয়েছে। 'সংযোজক' নবম শতকে ছিল মাত্রার সমান্তরাল এবং 'সংযোগ' ছিল মাঝারি। ত্রয়োদশ শতকে 'সংযোজক' নিম্নমুখী এবং 'সংযোগ' নীচু। চর্যার পুথির 'অ' আর পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'অ' আকারে প্রায় এক। পার্থক্যের মধ্যে চর্যার পুথিতে 'সংযোজক' নিম্নমুখী নয়, আবার পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির মত স্পষ্ট সমান্তরালও নয়— এই দু'য়ের মাঝামাঝি। 'সংযোগ' অবশ্যই

১৬. Bendall, *Catalogue*, পৃ: ২৭ ; *Palaeographical Society* (Oriental Series), plate xciii

পঞ্চাকার পুথির মতো নীচু নয়, একটু উঁচুতে। চর্যার পুথিতে দক্ষিণাংশের আঁকুড়িটি তেমন সুডোল এবং সুপুষ্ট নয়, আঁকুড়ির লেজটি মাঝ পথে ঠিক কাটা না পড়লেও পঞ্চাকার পুথির 'অ'র মতো লেজটি মাথায় ওঠে নি। সেইকারণে চর্যার পুথিতে 'অ' এবং 'ম' অক্ষরের মধ্যে গোলমাল হয়। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির কোনো কোনো 'অ'-এর দক্ষিণাংশের নীচে ত্রিভুজ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে 'সংযোজক' অর্ধ-বৃত্তাকার এবং সংযোজকের উৎপত্তি আঁকুড়ির নিম্নদেশ থেকে। 'সংযোগ' নীচু-ই বলতে হবে। সংযোজকের অর্ধবৃত্তাকার দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'অ' অক্ষরটিকে প্রাচীন বলে অনুমান করেছিলেন। এখানে বলা দরকার অর্ধবৃত্তাকার 'সংযোজক' কেবলমাত্র পুথির প্রথমাংশেই পাওয়া গেছে। 'অ' অক্ষরে অর্ধবৃত্তাকার 'সংযোজক' দ্বিতীয় কোনো বাংলা পুথিতে পাওয়া যায় নি, সুতরাং এটা প্রাচীন কি আধুনিক বুঝবার উপায় নেই। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য অক্ষরগুলি দেখলেই বোঝা যায় 'কোণ'-কে অর্ধবৃত্তাকার করা লিপিকরের বৈশিষ্ট্য। 'ক', 'খ', 'ধ', 'ব' প্রভৃতি অক্ষরের 'কোণ'গুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকর কলমটিকে ঘুরিয়ে অর্ধবৃত্তাকৃতি করেছেন— এটি যে বাংলা অক্ষরের প্রকারভেদ নয়, লিপিকরের বৈশিষ্ট্য, তা বোঝা যায় এই থেকে যে কোণাকার 'ব' এবং অর্ধবৃত্তাকার 'ব' পুথির একই জায়গায় পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত লিপিকর সাজিয়ে লিখতে গিয়ে 'কোণ'গুলি অর্ধবৃত্তাকার করেছেন। আধুনিক কালেও সাজিয়ে লিখতে গিয়ে কেউ কেউ এমন করে থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যাবতীয় অর্ধবৃত্ত-কে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলতে হবে।

নীচে বিভিন্ন পুথির 'অ' অক্ষরটি দেখানো হল।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'আ'র দীর্ঘত্ব দেখানো হয়েছে অক্ষরের নীচে পঞ্চাকার এবং চর্যার পুথিতে আধুনিক বাংলার মতো 'অ'-এর ডান পাশে দাঁড়ির মতো রেখা দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হয়েছে। এই দুখানি পুথিতেই 'অ' 'আ' আকারে এক, পার্থক্যের মধ্যে 'আ'-য় দাঁড়ি আছে।

ই

পারমেশ্বরতন্ত্রে 'ই' অক্ষরটির আকার দুটি বিন্দুর নীচে আঁকুড়ি চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ই' এক।

চর্যার 'ই'— , পঞ্চাকারের 'ই'— । পার্থক্যের মধ্যে চর্যার কোনো কোনো 'ই'-র ডান অংশ বাঁ-অংশের সঙ্গে যুক্ত নয়। চর্যা ও পঞ্চাকার পুথির 'ই'-র আকার বিচিত্র। Bhuler এই 'ই'-তে দক্ষিণ ভারতীয় লিপির প্রভাবের কথা বলেছেন। এই 'ই'-র সঙ্গে পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ই' এবং আধুনিক বাংলা 'ই'-র সাদৃশ্য নেই বলা চলে।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় ( ১৪৪৬ ) নকল করা কালচক্রতন্ত্র[১৭] এবং বোধিচর্যাবতার ( ১৪৩৫ ) পুথিতেই 'ই' পাওয়া যাচ্ছে আধুনিক বাংলার 'উ' র মতো, এমন কি মাথায় চৈতনও আছে—

আধুনিক বাংলার মত 'ই' দেখতে পাওয়া গেল পঞ্চদশ শতকের শেষে (১৪৮৯) নকল করা ধর্মরত্ন[১৮] পুথিতে—

এই পুথির 'ই' দেখে অনুমান করা চলে এর পূর্বরূপটি দেখতে পাওয়া গেছে কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। ধর্মরত্ন পুথির 'ই'-কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—১. চৈতন, ২. আধুনিক বাংলার 'ড'-এর মতো মধ্যাংশ, ৩. নিম্নমুখী রেখাটি।

কালচক্রতন্ত্র পুথিতে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি ছিল না। এবং মধ্যাংশের 'ড'-টির আকার বৃহৎ ছিল। ধর্মরত্ন পুথিতে মধ্যাংশের 'ড'-এর আকার কৃশ হয়েছে এবং 'ড'-এর লেজের কিছুটা কাটা পড়েছে; তবে তৃতীয়াংশের ঊর্ধভাগ 'ড'-এর সঙ্গে যুক্ত না হয়েও লেজের কাজ করছে। ধর্মরত্ন পুথির 'ই' থেকে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি বাদ দিলে যা থাকে তা কালচক্রতন্ত্র পুথির 'ই'।

কালচক্রতন্ত্র, ধর্মরত্ন, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—এই তিনখানি পুথির 'ই' পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ই' অন্য দুখানি পুথির 'ই'-র তুলনায় আধুনিক মনে হবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ই'-র মধ্যাংশ প্রায় আধুনিক হয়ে এসেছে 'ড'-এর আকার আর নেই, যদিও তৃতীয়াংশ মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তুলনার জন্য এই তিনখানি পুথির 'ই' পাশাপাশি রাখা হল।

কালচক্রতন্ত্র ধর্মরত্ন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ধর্মরত্ন এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ই' অল্পবিস্তর পরিবর্তিত অবস্থায় ষোড়শ শতকের একাধিক পুথিতে পাওয়া গেলেও চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ই' এই সময়কার অন্য কোনো পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই 'ই' বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত কিনা বলা শক্ত। তবে এ-কথা ঠিক আধুনিক বাংলা 'ই'-র সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ই'-র আঁকুড়িটি সম্ভবত ধর্মরত্ন এবং কালচক্রতন্ত্র 'ই'-র মধ্যাংশ। এই আঁকুড়িটি সম্ভবত পরে 'ড'-এর আকার নিয়েছিল। এবং 'ড'-এর লেজ কাটা গিয়ে এবং নিম্নমুখী রেখাটি যুক্ত হয়ে আধুনিক বাংলার 'ই'-র রূপ নিয়েছিল। এ-সমস্ত অনুমানের কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে আধুনিক বাংলায় 'ই' প্রকারান্তে 'হ', কেবল 'হ'-এর মাথায় চৈতন নেই। তবে 'হ' এবং 'ই' আধুনিক কালে প্রায় অভিন্ন হলেও অক্ষর দুটির বিবর্তনের ইতিহাস আলাদা। এ-কথা বলা চলে না যে কোনো একসময় 'হ'-এর মাথায় চৈতন জুড়ে দিয়ে 'ই' করা হয়েছে।

---

১৭. *Palaeographical Society* (Oriental Series) plate xxiii.

১৮. Rajendra Lal Mitra, *Notices of Sanskrit Manuscripts*, volume V, Plate II.

### উ

পঞ্চাকার এবং চর্যা-র পুথির 'উ' এক। অক্ষরটি দেখতে আধুনিক বাংলার 'ড'-এর মতো— মাথায় চৈতন নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'উ'-র মাথায়ও চৈতন নেই, সেখানেও অক্ষরটির আকার আধুনিক বাংলা 'ড'-এর মতো। এই রকম চৈতনহীন 'উ' অষ্টাদশ শতকে লেখা পুথিতেও পাওয়া যায় ( যদিও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চৈতনহীন 'উ'-কে পুথির প্রাচীনত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ); সুতরাং বলতে হবে দীর্ঘকাল যাবৎ এই অক্ষরটির আকারের কোনো পরিবর্তন হয় নি।

### এ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'এ' ত্রিভুজাকার।
পঞ্চাকার পুথিতে অক্ষরটির ত্রিভুজাকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, কেবল বাঁদিকের উপরের কোণটি খুলে গেছে। ডানদিকে উপরে ও নীচে তখনও কোণ আছে। ত্রিভুজের বাঁ বাহুটি ভূমিতে নেমে আসে নি। সে-তুলনায় চর্যার পুথির 'এ' অনেকটা আধুনিক। অক্ষরের উপরের দিকটা ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো, নীচের দিকটা প্রায় ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল, তবে ঢেউ খেলানো নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'এ' আর চর্যার পুথির 'এ' এক রকম।
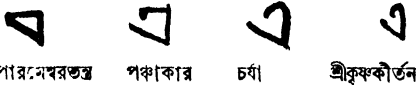
চর্যা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মিতাক্ষরা[১৯] (১৫০৬) ইত্যাদি পুথির 'এ' অক্ষরে কোনো পার্থক্য নেই। একমাত্র কালচক্রতন্ত্র পুথিতে 'এ'-র নিম্নবাহু দাঁড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়েছে, অন্যান্য পুথির মতো নীচু থেকে বেরয় নি। কালচক্রতন্ত্র পুথির 'এ' এই রকম— এ

### ঐ

আধুনিক বাংলাতেও 'এ' এবং 'ঐ' আকারে প্রায় অভিন্ন, পার্থক্যের মধ্যে 'ঐ'-র মাথায় চৈতন আছে। পারমেশ্বরতন্ত্রেও 'এ' 'ঐ'-র পার্থক্য কেবল চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'ঐ'-র চৈতন উঠেছে ত্রিভুজের ডানদিকে উপরের কোণ থেকে। পঞ্চাকার পুথিতেও চৈতন ডানদিকের কোণ থেকে উঠেছে, যদিও কোণ প্রায় বাঁকের আকার নিয়েছে। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ঐ' এক আকারের।
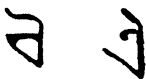
১৯. Rajendra Lal Mitra, *Notices of Sanskrit Manuscripts*, Vol. V, plate III.

### ও।ঔ

চর্যা-র পুথিতে আদ্যাক্ষরে 'ও' এবং 'ঔ' আমি দেখি নি, কারণ গোটা পুথির ছবি আমি পাই নি। তবে অনুমান করতে পারি চর্যা-র পুথির 'ও' এবং 'ঔ' পঞ্চাকার পুথি থেকে পৃথক নয়। আধুনিক বাংলার মতো 'ও' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং পঞ্চাকার পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে।

ও ও

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

'ঔ'-র আকার প্রায় 'ও'-র মতো, পার্থক্য শুধু চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'ঔ'-র চৈতন নেই, তবে ডানদিকে একটি কোণাকার রেখা আছে। পঞ্চাকার পুথিতে সেই কোণাকার রেখাটিকেই চৈতনে পরিণত করা হয়েছে।

ঔ ঔ

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

### পদমধ্যস্থিত স্বরবর্ণ

#### আ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে আদ্যাক্ষরে 'অ'-এর নীচে আঁকুড়ি দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হলেও, পদমধ্যস্থিত 'আ' আধুনিক বাংলার মতো দাঁড়ি দিয়ে দেখানো হয়েছে। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথিতেও পদমধ্যস্থিত 'আ' ব্যঞ্জনের ডানদিকে দাঁড়ি।

#### ই

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির অক্ষরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পদমধ্যস্থিত 'ই'। চর্যার পুথিতে পদমধ্যস্থিত 'ই' আধুনিক বাংলার মতো। ব্যঞ্জনের বাঁদিকে দাঁড়ি এবং দাঁড়ির মাথায় ছত্রাকার একটি রেখা। চর্যার পুথিতে কখনও কখনও মনে হয় দাঁড়ি এবং ছত্রাকার রেখাটি কলমের একটি টানে লেখা হয়েছে। পঞ্চাকার পুথিতে ছত্রাকার রেখাটি আছে কিন্তু দাঁড়িটি নেই। যেমন নীচের 'অমিতাভ' শব্দটিতে।

অমিতাভ

Bendall-এর মতে[২০] পদমধ্যস্থিত 'ই'-র এই আকার প্রাচীন। তবে চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ই' পঞ্চাকার পুথিরও কয়েক জায়গায় দেখা যায়।

---

২০. "The writing is Bengali, with several antique features, e.g. medial *i* written simple curve above its consonants, not before it." Bendall, *Catalogue*, পৃ. ১০৬

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে পদমধ্যস্থিত 'ই'-র দাঁড়িটি আছে, ছত্রাকার ঊর্ধাংশটি অনেক জায়গায়, নেই যেখানে আছে সেখানেও ঠিক ছত্রাকারে নেই, প্রায় মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে। মিতাক্ষরা পুথিতেও কয়েক জায়গায় ছত্রাকার ঊর্ধাংশটি মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে। আবার কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), শকুন্তলা (১৫৭১), ধর্মরত্ন (১৪৮৯), শিশুপালবধ (১৫১১) প্রভৃতি পুথিতে ছত্রাকার ঊর্ধরেখাটি বেশ স্পষ্ট। পারমেশ্বরতন্ত্র (৮৫৮ খ্রীঃ) পুথিতে পদমধ্যস্থিতই চর্যার মতো (পঞ্চাকার পুথির মতো নয়) এবং ছত্রাকার ঊর্ধাংশটি বেশ স্পষ্ট এবং ব্যঞ্জনের উপর অনেকখানি উঁচুতে উঠেছে। ১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা 'শিষ্যালেখ'[২০] পুথিতেও (এ পুথিখানির অধিকাংশ অক্ষরগুলি নেওয়ারী) পদমধ্যস্থিত 'ই' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং চর্যা-র মতো। সুতরাং আধুনিক বাংলায় প্রচলিত পদমধ্যস্থিত 'ই'—যা চর্যার পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে—নবম শতকের পুথিতেও (পারমেশ্বরতন্ত্র) অবিকল সেই আকারে পাওয়া যাচ্ছে। তাই Bendall ঠিক কেন পঞ্চাকার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ই'-কে প্রাচীন বলেছেন, বোঝা গেল না।

উ

আধুনিক বাংলায় পদমধ্যস্থিত 'উ' ব্যঞ্জনবর্ণ অনুসারে বিবিধ প্রকারের হয়ে থাকে, 'শু', 'কু', 'রু' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। চর্যার পুথিতেও এই রীতি।

চর্যার পুথিতে 'রু' আধুনিক বাংলার মতো। 'উ' যুক্ত হয়েছে 'র'-র ডান অংশের মাঝখানে, অন্যান্য অক্ষরের মতো ব্যঞ্জনের নীচে নয়। তবে 'উ'-র আকার আধুনিক বাংলার মতো উল্টো 'কমা' কিনা বলা শক্ত, সম্ভবত নয়। যতদূর মনে হয় মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল একটি রেখা বেরিয়ে এসেছে, 'কমা'-র আকার পায় নি।

'তু' চর্যার পুথিতে আধুনিক বাংলার 'ত্ত'। 'তু' এবং 'ত্ত' লিখতে চর্যার পুথির লিপিকর এই একটি অক্ষরই ব্যবহার করেছেন। 'গু' এবং 'শু' অবিকল আধুনিক বাংলার আকার না পেলেও প্রবণতা সেই দিকে। 'গ' এবং 'শ'-এর দাঁড়ির নীচের দিকটা বাঁ দিকে বেঁকে গিয়েছে 'ত'-এর নিম্নাংশের মতো।

'পু', 'দু', 'সু', 'মু' লিখতে চর্যার লিপিকর যে 'উ' ব্যবহার করেছেন তার আকার আধুনিক বাংলার 'ব' ফলার মতো। 'থু' 'ষু' প্রভৃতি অক্ষরে আধুনিক বাংলার 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে 'উ' ব্যঞ্জনের নীচে একটি আঁকুড়ি চিহ্ন হয়ে এমনভাবে ঝুলে থাকে যে ব্যঞ্জনটিকে আঁকুড়ি চিহ্ন থেকে সহজে পৃথক করা যায়।

চর্যার পুথিতে আরও একরকমের 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে 'কু' লিখতে গিয়ে। সেখানে 'উ' আর স্বতন্ত্র নেই, ব্যঞ্জনের অক্ষর গঠনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে।

সুতরাং চর্যার পুথিতে পাঁচ রকমের পদমধ্যস্থিত 'উ' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

১. আধুনিক বাংলার 'ত' এর নিম্নাংশের মতো। এই 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে 'গু' এবং 'শু' লিখতে।

২. ব্যঞ্জনের মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত উ, যেমন 'রু'

৩. ব্যঞ্জনের নিম্নাংশের সঙ্গে যুক্ত আঁকুড়ি চিহ্ন, যেমন 'থু', 'ষু' ইত্যাদি

৪. ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত যেমন, 'কু'। এখানে 'উ' ব্যঞ্জন থেকে আলাদা করা যায় না।

৫. ব্যঞ্জনের নীচে 'ব' ফলার মতো, যেমন 'পু' 'তু' ইত্যাদি।

এই পাঁচ প্রকারের পদমধ্যস্থিত 'উ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সমস্ত বাংলা পুথিতে দেখতে পাওয়া যায়।

চর্যার কয়েকটি পদমধ্যস্থিত 'উ'-র দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল।

রু মু ড়ু তু সু গু ষু কু

এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদমধ্যস্থিত 'উ'-র তুলনা করা যেতে পারে।

শু ড়ু রু কু নু যু সু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'সু' 'যু' '(মু)' চর্যার 'কু' শ্রেণীর, অর্থাৎ 'উ' ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত, স্বতন্ত্র নয়। চর্যার 'কু' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কু' আকারে প্রায় এক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার স্থান এটি নয়, তথাপি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'যু' এবং 'মু' অভিন্ন, 'নু' এবং 'ন্ন' আকারে অভিন্ন (তুলনীয়, 'আনুমান' এবং 'জগন্নাথ'), আদ্যাক্ষর 'ঈ' 'দ্দ' এবং 'কু' অভিন্ন (তুলনীয়, 'ঈসত' 'উদ্দেশ' এবং 'গোকুল'), 'যু' ('মু')-র পাশে একটি ছোটো রেখা যোগ করলে 'ক্ষ' হয়। অর্থাৎ পদমধ্যস্থিত 'উ' যেমন অনেকগুলি ব্যঞ্জনের আকারে পরিবর্তন এনেছে তেমনি সেই অক্ষরগুলি একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

এবার ষোড়শ শতকের এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কয়েকখানি পুথির পদমধ্যাস্থ 'উ'-র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

| মিতাক্ষরা | ধর্মরত্ন | শূদ্রপদ্ধতি | কালচক্রতন্ত্র |
| --- | --- | --- | --- |
| সু রু কু পু | তু শু | পু ষু গু | বু |

কবিকঙ্কণ (সপ্তদশ শতকের শেষ)

'কু' 'পু' 'শু'

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে চর্যার পুথির পাঁচ শ্রেণীর পদমধ্যস্থিত 'উ'-র প্রত্যেকটি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পৌঁচেছে।

### উ

চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'উ' আধুনিক বাংলার মতো, তবে চিহ্নটিতে সম্পূর্ণতা আসে নি। নীচের 'শূ' দেখলেই বোঝা যাবে যে চিহ্নটির গতি আধুনিক বাংলার 'উ'-র দিকে।

শূ

'শূ' ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলিতে পদমধ্যস্থিত 'উ' আধুনিক বাংলার 'উ'-র সঙ্গে অভিন্ন।

### ঋ।এ।ঐ।ও।ঔ

চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ঋ', 'এ', 'ঐ', 'ও', 'ঔ' আধুনিক বাংলার ঐ স্বর-চিহ্নগুলি থেকে একটুও পৃথক নয়। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে এ-মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

গৃ বে দৈ বো যৌ

গৃ বে দৈ ৰো যৌ

(উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে 'য' অক্ষরটির আকার এখানে একটু বিচিত্র, অন্যত্র অবশ্য স্বাভাবিক 'য' আছে।) পদমধ্যস্থিত 'ঋ', 'এ', 'ও' চিহ্ন আধুনিক বাংলা থেকে একটুও পৃথক নয়। কেবল 'ঐ' এবং 'ঔ'-র চৈতনের উৎপত্তিস্থল আধুনিক বাংলা থেকে পৃথক। আধুনিক বাংলায় 'ঐ'-র চৈতনের উৎপত্তি 'ে'-এই আঁকুড়ি-চিহ্নটির উপর থেকে, 'ঔ'-র চৈতনের উৎপত্তি 'ে া' দাঁড়ির মাথা থেকে।

ব্যঞ্জনবর্ণ

### ক

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক' প্রায় আধুনিক বাংলার মতো। সুতরাং অক্ষরটির গঠন নবম শতকেই সম্পূর্ণ হয়েছে। পরবর্তীকালে পরিবর্তন যা হয়েছে তা যৎসামান্য। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'ক' ত্রিভুজাকার এবং ডানদিকে আঁকুড়ি। ডানদিকের আঁকুড়িটি একটু বেশি লম্বিত, প্রায় ভূমি স্পর্শ করেছে। আঁকুড়িটি মাত্রারেখা এবং ত্রিভুজের সংযোগস্থল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ির মতো রেখাটির সমান্তরাল হয়ে লম্বিত।

চর্যার পুথির 'ক' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক' থেকে বেশি পৃথক নয়। দুখানি পুথির 'ক'-তেই সূক্ষ্ম কোণ আছে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক'-এর আঁকুড়িটি বেশি লম্বিত, চর্যার 'ক'-এর আঁকুড়ি অত লম্বিত নয়।

আঁকুড়ির দৈর্ঘ্য অনুসারে চর্যার পুথির 'ক' দুই শ্রেণীতে পড়ে। এক শ্রেণীর আঁকুড়ি দীর্ঘ এবং বেশি বাঁকান নয়, সম্ভবত এইটি প্রাচীন রীতি, আর এক শ্রেণীর আঁকুড়ি ছোট এবং বাঁকান। যেমন,

ক ক

দীর্ঘ এবং স্বল্পবক্র আঁকুড়িকে প্রাচীন মনে করেছি, এই কারণে যে এইরকম আঁকুড়ি পারমেশ্বরতন্ত্র এবং শিক্ষালেখ পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে। এই দুখানি পুথিতে ছোট এবং বাঁকান আঁকুড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। চর্যায় দু-রকমই আছে। আবার, পঞ্চাকার (১১৯৯), কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬), শিশুপালবধ (১৫১১), ধর্মরত্ন (১৪১৭), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) সর্বত্রই 'ক' অক্ষরটিতে ছোট

এবং বাঁকান আঁকুড়ি। স্থতরাং স্বভাবতই অনুমান করা যায় দীর্ঘ এবং স্বল্প বক্র আঁকুড়ি প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এক রকমের 'ক' দেখতে পাওয়া যায় তাতে আঁকুড়ি নেই। দ্রুত এবং টানা লিখতে গিয়ে আঁকুড়ি ত্রিভুজের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

পারমেশ্বরতন্ত্র শিয়ালেখ পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

খ

পারমেশ্বরতন্ত্র (৮৫৭-৫৮) এবং শিয়ালেখ (১০৮৪) পুথির 'খ'-র সঙ্গে আধুনিক বাংলা 'খ'-র সাদৃশ্য নেই। আধুনিক বাংলা 'খ' দেখতে পাওয়া গেল চর্যা এবং পঞ্চাকার (১১৯৯) পুথিতে। এই 'খ' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং শিয়ালেখ পুথির 'খ' থেকে উদ্ভূত কিনা বা চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'খ'-এর বিবর্তনের স্বতন্ত্র কোন ইতিহাস আছে বলা শক্ত।

কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ' বিচিত্র আকারের। এই পুথির 'খ'-র সঙ্গে চর্যার পুথির 'খ'-র কিছুমাত্র সাদৃশ নেই বলা যায় না। তবে চর্যার পুথির 'খ' সরল এবং আধুনিক বাংলা 'খ'-র বেশি কাছাকাছি। কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ'-র বাঁ অংশটি জটিল। অক্ষরটির গঠন দেখে বলতেই হয় কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ চর্যার পুথির 'খ' থেকে পুরাণো। কিন্তু কালচক্রতন্ত্রের অন্য অক্ষরগুলি যে চর্যার পুথির তুলনায় আধুনিক, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সম্ভবত 'খ' অক্ষরটি প্রাচীন রূপ কোনো অজ্ঞাত কারণে এই পুথিতে রক্ষা পেয়েছে। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে চর্যার পুথির 'খ'-র পূর্বরূপ দেখতে পাওয়া গেল কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কালচক্রতন্ত্রের 'খ' কি পারমেশ্বরতন্ত্র এবং চর্যার 'খ'-এর মধ্যবর্তী রূপ ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। বিভিন্ন পুথির 'খ'গুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পারমেশ্বরতন্ত্র এবং কালচক্রতন্ত্র[২১] পুথির 'খ' স্পষ্টই নেওয়ারী। এই রকম 'খ' সমস্ত নেওয়ারী পুথিতে পাওয়া যায়। চর্যা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'খ' বাংলা। এ-অনুমান হয়তো অসঙ্গত নয় যে কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ' থেকে চর্যার পুথির 'খ'-র উৎপত্তি।

২১. এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলা বর্ণমালার সব অক্ষরের বঙ্গীয়ত্ব একই সময় প্রকাশ পায় নি। কোনো কোনো অক্ষরের বাংলা রূপ (যেমন 'ক') অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছে: কোনো কোনো অক্ষরের পরে। সুতরাং একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাংলা অক্ষরে লেখা পুথি মানে এই নয় যে তার প্রত্যেকটি অক্ষরকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বাংলা বলে প্রমাণ করা যায়। এখানে কালচক্রতন্ত্র পুথিখানি যে বাংলা অক্ষরে লেখা তা যে-কোনো বাঙালি পুথিখানিকে একবার চোখে দেখলেই স্বীকার করবেন; তথাপি এই পুথিতে একটি নেওয়ারী অক্ষর পাওয়া গেল।

### গ

‘পারমেশ্বরতন্ত্র’ পুথির ‘গ’ অক্ষরটির বাঁ অংশে কিছু কারুকার্য আছে। কারুকার্যটুকু বাদ দিলে অক্ষরটি আধুনিক বাংলার রূপ পায়। চর্যার পুথিতে তাই হয়েছে ; তাই চর্যার ‘গ’ আধুনিক বাংলার মত।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

### চ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির ‘চ’ অক্ষরটির ডান অংশটি দাঁড়ি, বাঁ অংশটি অর্ধবৃত্তাকার। চর্যার পুথির ‘চ’-তে দাঁড়ি নেই। অর্ধবৃত্তাকার অংশটি মাত্রার সঙ্গে ঝুলে আছে। অর্ধবৃত্তাকার বাঁ অংশটি ছুঁচলো, পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতেও তাই ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছুঁচলো অংশটা সরল হয়ে প্রায় ডিম্বাকার হয়েছে। কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ‘চ’ এক।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

### জ

আধুনিক বাংলায় ‘ড’-র ডানদিকে বাহু যোগ করলে ‘জ’ হয়। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে যে ‘জ’ পাওয়া যাচ্ছে তাও এইরকম, তবে ‘জ’-এর ‘ড’ আধুনিক আকার পায় নি। বাহুও বাঁকানো নয়, নিম্নগামী একটি সরলরেখা। পঞ্চাকার পুথিতে ‘ড’ আধুনিক আকার ধারণ করেছে বটে তবে বাহু এখনও পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির মতো।

চর্যার পুথিতে দু-রকম ‘জ’ দেখা যাচ্ছে। একরকমে বাহুর অর্ধেকটুকু আছে, বাহু-রেখাটি মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, আর একরকমে বাহু বেঁকে ভূমি পর্যন্ত গিয়েছে। ষোড়শ শতকের বহু পুথিতে বাহুর অর্ধ এবং সম্পূর্ণরূপ একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

| পারমেশ্বরতন্ত্র | পঞ্চাকার | চর্যা | চর্যা | কালচক্রতন্ত্র | শ্রীকৃষ্ণকীর্তন | শিশুপালবধ | শূদ্রপদ্ধতি | শকুন্তলা | মিতাক্ষরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ | ১১৯৯ খ্রীঃ | | | ১৪৪৬ খ্রীঃ | | ১৫১১ খ্রীঃ | ১৫১৪ খ্রীঃ | ১৫৭[illegible] খ্রীঃ | ১৫০৬ খ্রীঃ |

‘জ’-র বাহুর পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত আকারের উপর অক্ষরটির প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব নির্ভর করছে না। দশম শতকের অনেক নেওয়ারী পুথিতে ‘জ’-এর পূর্ণ বাহু ছিল। উপরের উদাহরণগুলিতে একটি বিষয় লক্ষণীয়। শূদ্রপদ্ধতি শকুন্তলা পুথিতে ‘জ’-এর নিম্নভাগের লেজটি মাথায় উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং চর্যা পুথিতে লেজ মাথায় না উঠলেও অনেকখানি এগিয়েছে। পারমেশ্বরতন্ত্রে লেজটি কাটা গিয়েছে। লেজের ক্রমবর্ধমান আকারের সঙ্গে অক্ষরের প্রাচীনত্ব-আধুনিকত্বের যোগ আছে। বাংলায় লেজওয়ালা

অক্ষর অনেকগুলি 'ভ', 'ত', 'জ', 'ড' ইত্যাদি। পুথি কালের দিক থেকে যত আধুনিক লেজ তত বেশি মাথায় উঠেছে। লেজকে মাথায় তোলা বাংলা লিখনভঙ্গীর একটি বৈশিষ্ট্য।

ঝ

চর্যার পুথিতে 'ঝ' আধুনিক বাংলার মতো।

ঝ

ট

চর্যার পুথির 'ট' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ট' থেকে বিশেষ পৃথক নয়। এখনও চৈতন দেখা যাচ্ছে না, গলার কাছে খাঁচটা পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে বেশি, চর্যার পুথিতে কম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে খাঁচটি প্রায় মিলিয়ে এসেছে এবং মাথায় চৈতনও দেখা দিয়েছে।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ধর্মরত্ন

উপরের এই ছয়টি 'ট'-র গঠন পরীক্ষা করলে এদের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হয়। অক্ষরগুলির গঠনে দুটি বিষয় লক্ষণীয় গলার কাছের খাঁচের ক্রমবিলীয়মানতা এবং চৈতনের আবির্ভাব। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে খাঁচটি স্থূক্ষ্ম, চৈতন নেই তবে চৈতনের বদলে একটি ছোটো নিম্নগামী রেখা আছে। চর্যার এবং পঞ্চাকার পুথিতে গলার খাঁচের স্থূক্ষ্মতা কমে গেছে এবং পঞ্চাকারে যেন চৈতনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কালচক্রতন্ত্র পুথিতে গলার খাঁচটি উপরে উঠেছে, খাঁচের স্থূক্ষ্মতা আরও কমে গেছে, নিম্নভাগ অনেকটা আধুনিক বাংলা 'ট'-এর আকার নিয়েছে। চৈতন ও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গলার খাঁচটি মিলিয়ে গিয়ে সে-জায়গায় একটু বাঁক দেখা দিয়েছে। চৈতনের আকার আধুনিক হয়েছে। ধর্মরত্ন পুথিতে গলার কাছের বাঁকটি অনেকটা সরল হয়ে আধুনিক বাংলা 'ট'-তে পরিণত হয়েছে।

ঠ

চর্যার পুথির 'ঠ' গোলাকার, এমন গোলাকার যে তার সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে তাকে মাত্রাহীন 'ন' বলে ভুল হয়। এই কারণে শাস্ত্রী এক জায়গায় 'বইঠা'-কে 'বইণ' পড়েছেন। এই আকারের 'ঠ' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতেও পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ঠ' ডিম্বাকার, উপরের দিকটা সরু, নীচের দিকটা স্ফীত। অক্ষরটি মাত্রা ধরে দোদুল্যমান।

ঠা

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ড

আগেই বলা হয়েছে চর্যার পুথিতে 'ড', 'ড়' এবং 'উ'—এই অক্ষর তিনটির মধ্যে আকারগত কোনো পার্থক্য নেই। স্থতরাং 'গাইউ'-কে 'গাইড়' বা 'গাইড' পড়তে কোনো বাধা নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেও এই রীতি,

'উ'-র মাথায় চৈতন নেই, 'ড়'-র নীচে বিন্দু নেই। 'ড'-র মাথায় চৈতন দিয়ে 'উ', এবং নীচে বিন্দু দিয়ে 'ড়' অষ্টাদশ শতকের শেষে পাওয়া যায়। বিন্দু এবং চৈতনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হয়েছে ; তাই 'চর্যা' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পুরাণো বলতে হয় এবং চর্যাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়েও পুরাণো বলতে হয়, কারণ চর্যার 'ট' অচৈতন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ট' চৈতনযুক্ত।

ণ

আধুনিক বাংলায় 'ণ' এবং 'ন'-র পার্থক্য গুরুতর নয়। 'ণ' মাত্রাহীন, 'ন'-য় মাত্রা আছে। 'ণ'-র বাঁ অংশের ডান অংশের সঙ্গে সংযোগ উঁচুতে, 'ন'-র মাঝে। চর্যা এবং কোনো কোনো পুরাণো বাংলা পুথিতে 'ণ' এবং 'ন'-র পার্থক্য এর চেয়ে বেশি ছিল।

চর্যার পুথির 'ণ'-র বাঁ অংশটির আকার আধুনিক বাংলার 'ল'-র বাঁ-অংশের অনুরূপ। এবং বাঁ-অংশ ও ডান অংশের সংযোগ উঁচুতে, প্রায় মাত্রার কাছাকাছি। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ণ'-র সঙ্গে তুলনায় চর্যার 'ণ'-র বাঁ-অংশ অনেক সরল। চর্যার পুথির 'ণ'-কে বলতে পারি দ্বি-বাঁকযুক্ত 'ণ', কারণ এর বাঁ অংশে দুটি বাঁক আছে।

দ্বি-বাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে চর্যার পুথিতে, পঞ্চাকার (১১৯৯), কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), ধর্মরত্ন (১৪৮৯), চোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) পুথিতে।

এক বাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মিতাক্ষরা (১৫০৬), শিশুপালবধ (১৫১১), শকুন্তলা (১৫৭১) পুথিতে।

দ্বিবিধপ্রকার 'ণ'-র মধ্যে দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' যে প্রাচীন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ নেই, কারণ পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ণ'-এর সঙ্গে তুলনায় এই 'ণ'-এর ইতিহাসটি পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া তারিখযুক্ত প্রাচীন পঞ্চাকার পুথিতে শুধু দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে।

ধর্মরত্ন (১৪৮৯) পুথিতে দ্বিবিধপ্রকারের 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং একবাঁকযুক্ত 'ণ'-র এক দিকের সীমা ১৪৮৯-কে ধরা যেতে পারে। আবার দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪) পুথিতে। তাহলে বুঝতে হবে ১৪৮৯-১৫১৪ এই সময়ের মধ্যে দ্বিবিধপ্রকারের 'ণ'-র ব্যবহারই চালু ছিল। কিন্তু ১৫১৪-র পরে দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' আর পাওয়া যায় নি।

বিরুদ্ধপ্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান বোধহয় অযৌক্তিক হবে না যে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরে প্রাচীন 'ণ'-র প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যে-পুথিতে আধুনিক (অর্থাৎ একবাঁকযুক্ত) 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছিল সে-পুথির লিপিকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে নয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে চর্যার পুথি ষোড়শ শতকের আগে লেখা। কত আগে সে-বিচার স্বতন্ত্র, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকালের ঊর্ধ্ব সীমা ১৫১৪।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শূদ্রপদ্ধতি ধর্মরত্ন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শকুন্তলা শিশুপালবধ মিতক্ষরা

ত

চর্যার পুথিতে 'ত' এবং 'দ'-র মধ্যে গোলমাল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দুটি অক্ষরেই মাত্রা থেকে একটি রেখা নীচের দিকে বেরিয়ে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। আধুনিক বাংলায় 'ত' অক্ষরের মাত্রার নীচে বিন্দু আছে এবং লেজটি সেই বিন্দু থেকে বেরিয়েছে। চর্যার পুথিতে বিন্দুর বদলে একটি রেখা আছে

এই রেখাটি থেকে লেজ নির্গত হয়েছে, পরে লেজটি পাক খেয়ে নীচের দিকে নামলে কাটা পড়েছে

তাই 'ত' দেখতে 'দ'-র মতো হয়েছে। পঞ্চাকার পুথিতে আধুনিক বাংলার 'ত' দেখা গেল। এই পুথির 'ত'-তে দেখা যাচ্ছে মাত্রা থেকে একটি রেখা নীচের দিকে নেমে এসেছে, রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি বিন্দু, এই বিন্দু থেকে লেজ বেরিয়েছে। লেজ মাঝপথে কাটা পড়ে নি, মাথা পর্যন্ত উঠেছে। কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ত' পঞ্চাকারের 'ত'-র মতো। পঞ্চাকার পুথির সাক্ষ্যে বলা যায় 'ত'-র লেজ মাথায় উঠেছে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে। পরবর্তী কোনো পুথিতে লেজ কাটা 'ত' দেখা যাচ্ছে না। তবে এ-ব্যাপারে 'ত'-র লেজই একমাত্র সাক্ষ্য নয়। বাংলায় যতগুলি লেজযুক্ত অক্ষর আছে, যেমন ড, 'ভ', 'ত', 'জ', 'ড'— এই সবগুলি অক্ষরের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে ত্রয়োদশ শতকের আগে এই অক্ষরগুলির কোনোটিরই লেজ মাথায় ওঠে নি, প্রত্যেকটিরই লেজ মাঝপথে কাটা পড়েছে। নীচে বিভিন্ন পুথির 'ত' অক্ষরটি দেখান হল।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

থ

চর্যার পুথির 'থ' আধুনিক বাংলার মতো। তবে বাঁ অংশ এবং ডান অংশের 'সংযোগ' সূক্ষ্ম কোণাকৃতি নয়, নীচেয়ও নয়। আগেই বলা হয়েছে যে বাংলার অক্ষরের ডান অংশ এবং বাঁ-অংশের 'সংযোগ' সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রাচীন অক্ষরে 'সংযোগ' অপেক্ষাকৃত উপরের দিকে, আধুনিক অক্ষরে অপেক্ষাকৃত নীচের দিকে। 'ত' 'ভ' 'ড'-র লেজ উপরে ওঠা যেমন আধুনিকতার লক্ষণ, তেমনি 'খ' 'য' 'ব' 'ম' প্রভৃতি অক্ষরের 'সংযোগ' নীচের দিকে নেমে আসা এবং সূক্ষ্ম কোণাকার হওয়া আধুনিকতার লক্ষণ। 'থ' অক্ষরটিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সংযোগ সূক্ষ্ম কোণাকারও নয়, ঠিক নীচেয়ও নয়।

'চর্যার 'থ'-র সঙ্গে তুলনীয় পঞ্চাকার পুথির 'থ' অক্ষরটি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘থ’ পঞ্চাকার পুথির মতো-ই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির অন্যান্য অক্ষরে যেমন এই অক্ষরেও তেমনি কিছু অলঙ্কার আছে।

থ

দ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে ‘দ’-র আকার কিছু জটিল। পঞ্চাকার ও কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও এই জটিল ‘দ’। কিন্তু চর্যার পুথির ‘দ’ সরল, আধুনিক বাংলা ‘দ’-র সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। আগেই বলা হয়েছে চর্যার পুথির ‘দ’ অনেকটা ‘ত’-র মতো। ‘ত’ র মতো ‘দ’ অক্ষরেও মাত্রা থেকে একটি রেখা নেমে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। চর্যার পুথিতে এই রেখাটি সরল, পঞ্চাকার, কালচক্রতন্ত্র পুথিতে এই রেখাটি সরল নয়।

দ দ দ দ

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র চর্যা

এই চারটি ‘দ’-র মধ্যে ‘চর্যা’-র ‘দ’-কে আধুনিক বলতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং ষোড়শ শতকের অন্যান্য পুথির ‘দ’ চর্যার ‘দ’ থেকে পৃথক নয়।

ধ

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির ‘ধ’ এক। মাথায় সামান্য একটু ‘বাড়ী’ বোধহয় আছে। তবে ‘বাড়ী’ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদমধ্যস্থিত ‘ই’ বা ‘এ’-র সঙ্গে মিশে রয়েছে বলে এর দৈর্ঘ্য বা অস্তিত্ব অনুমান করা শক্ত। কালচক্রতন্ত্র পুথিতে ‘ধ’-র মাথায় ‘বাড়ী’ আছে; তবে ‘বাড়ী’ মাত্রারেখা ছাপিয়ে উপরে ওঠে নি; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘ধ’ আর কালচক্রতন্ত্র পুথির ‘ধ’ এক।

ধ ধ ধ ধ

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সম্ভবত চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির ‘ধ’-র বাড়ী নেই। যদি থাকে, তাহলে তা ‘ই’-র ছত্রের সঙ্গে মিশে গেছে এবং কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘ধ’-র মত ‘বাড়ী’ নীচের দিকেও নামে নি, উপরের দিকেও ওঠে নি। ‘বাড়ী’ না থাকলে চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির ‘ধ’-র আকার ‘ব’-র মতো হয়। তবে ‘ব’ এবং ‘ধ’-র গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ ‘ব’-য় মাত্রা আছে, ‘ধ’-য় মাত্রা নেই।

ন

চর্যার ‘ন’ আধুনিক বাংলার মতো বটে তবে পঞ্চাকার পুথির ‘ন’-র সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে চর্যার পুথিতে বাঁ অংশ এবং ডান অংশের সংযোগটি একটু উপরে, পঞ্চাকার পুথিতে নীচে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেও ‘সংযোগ’ পঞ্চাকার পুথির মতো।

ন ন ন ন

চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

প

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'প'-র বাঁ অংশ ঠিক টাঙ্গীর মতো নয়, আধুনিক বাংলা 'য'-র মতো। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'প' সামান্য পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাকার পুথিতে। পরিবর্তনের মধ্যে উপরের দিকটা জুড়ে গেছে, পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে উপরের দিকটা খোলা ছিল। এই দুটি 'প'-র আকার তুলনা করলেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

পঞ্চাকার পুথির 'প'-র তুলনায় চর্যার 'প' আধুনিক বাংলা 'প'-র বেশি কাছাকাছি। চর্যার পুথিতে 'প'-র বাঁ-অংশ টাঙ্গীর আকার ধারণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'প' অক্ষরটির বাঁ-অংশ, ডান অংশ থেকে যেন সম্পূর্ণ আলাদা। দুটি অংশ এক হয়েছে মাত্রার সূত্রে। মাত্রা না থাকলে দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বাঁ অংশের আকারও ঠিক টাঙ্গীর মতো নয়।

চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ষোড়শ শতকের সমস্ত পুথিতেই চর্যার পুথির 'প' দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'প' বড়ই অদ্ভুত। এইরকম মাত্রা থেকে ঝুলে থাকা 'প' দ্বিতীয় কোনো পুথিতে দেখা যায় নি। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'গ' অক্ষরটির সঙ্গে তুলনা করলে 'প'-র অদ্ভুত আকারকে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যায়। 'গ'-র বাঁ দিকের আঁকুড়িটিও মাত্রা থেকে ঝোলা।

ব

চর্যার 'ব' আধুনিক বাংলার মতো। অক্ষরটির ত্রিকোণাকার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বটে তবে বাঁ অংশ এবং ডান অংশের সংযোগ এখনকার 'ব'-র মতো নীচেয় নয়। সে তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'ব আধুনিক বাংলা 'ব'-র বেশি কাছাকাছি।

চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

এর মধ্যে এক পঞ্চাকার ছাড়া আর কোনো পুথির 'ব' অক্ষরে সূক্ষ্ম কোণ নেই। তবে প্রবণতা সেইদিকে।

ভ

চর্যার 'ভ'-র লেজটি মাঝপথে কাটা পড়েছে, যেমন কাটা পড়েছে 'ত'-র লেজ। মাথার দিকটাও জটিল।

সে তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'ভ' আধুনিক বাংলা 'ভ'-র বেশি কাছাকাছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং পঞ্চাকার পুথির 'ভ' এক রকম।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত কালচক্রতন্ত্র

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ভ' চর্যার পুথির 'ভ' থেকে বেশি পৃথক নয়, কেবলমাত্র চর্যার পুথিতে লেজ একটু বেঁকেছে। পঞ্চাকার পুথিতে পরিবর্তন অনেক বেশি। লেজ অনেকখানি বেঁকেছে, মাথার দিকটাও সরল হয়েছে। একেবারে আধুনিক বাংলার 'ভ' দেখা যাচ্ছে শকুন্তলা (১৫৭১) পুথিতে।

ম

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ম' আধুনিক বাংলার মতো।

চর্যা পঞ্চাকার

য

চর্যার পুথিতে 'য' এবং 'য়' কোনো পার্থক্য নেই, বলা বাহুল্য, প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ পুথিতেই নেই। চর্যার 'য' অক্ষরটি অন্যান্য অক্ষরের তুলনায় কিছু বিচিত্র আকারের। প্রথমত, বাঁদিকের নীচের রেখাটি মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, এটি হওয়া উচিত ছিল নিম্নগামী এবং ঈষত বক্র, যেমন 'ব' 'র' ইত্যাদি অক্ষরে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, বাঁ অংশ এবং ডান অংশের 'সংযোগ' অনেক উঁচুতে। চর্যার অনেক অক্ষরেই 'সংযোগ' উঁচুতে, তবে 'য' অক্ষরটিতে যেন কিছু বেশি উঁচুতে।

চর্যার 'য'-র তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'য' আধুনিক বাংলা 'য'-র বেশি কাছাকাছি। এই পুথির 'য'-র 'সংযোগ' অনেক নীচুতে, যেমন বাংলা অক্ষরের পক্ষে স্বাভাবিক।

কালচক্রতন্ত্র পুথির 'য'-তে কোণগুলি খুব সূক্ষ্ম এবং 'সংযোগ' খুব নীচুতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে 'য'-র কোণ সূক্ষ্ম নয় ( না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অধিকাংশ অক্ষরেরই কোণ সূক্ষ্ম নয় ) তবে 'সংযোগ' নীচুতে।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

র

আধুনিক বাংলা 'র' এবং 'ব'-র পার্থক্য বিন্দুতে। ষোড়শ শতকের অনেক পুথিতে ( যেমন ধর্মরত্ন, মিতাক্ষরা ) এবং তার পরবর্তীকালের বহু পুথিতে 'র' 'ব'-র কোনো আকারগত পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং ষোড়শ শতকের কোনো কোনো পুথিতে 'র'-র পেট চিরে 'ব' থেকে পৃথক করা হয়েছে।[২২]

---

২২. পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে [ ১৪৯৬ খ্রীঃ ] নকল করা একখানি পুথিতে [ বর্ধমান রচিত 'গঙ্গাকৃত্যবিবেক', বৃটিশ মিউজিয়ামের পুথি, সংখ্যা Or 8567 a. ] দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' এবং পেট-কাটা 'র' একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই পুথির লিপিকাল যদি ঠিক হয় ( লিপিকালের জন্য দ্রষ্টব্য Killhorn, JAASB, 1898, পৃ. ২৩২ ) তাহলে পেট কাটা 'র'-র একটা নিম্নসীমা পাওয়া যাচ্ছে ১৪৯৬। এর আগেও পেট কাটা 'র'-র প্রচলন ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পেট-কাটা 'র' আছে বটে, কিন্তু এক বাঁকযুক্ত 'ণ'।

চর্যা, পঞ্চাকার এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে ‘র’-র পেটটিকে মসীলিপ্ত করে ‘ব’ থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই রকম মসীলিপ্ত ‘র’ এই তিনখানি পুথিতে ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই তিনখানি পুথি-ই নেপালে পাওয়া। সুতরাং এই রীতিটি নেপাল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল কিনা সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। চর্যার ‘র’ নিম্নরূপ।

### ল

চর্যার পুথিতে দুই রকম ‘ল’ পাওয়া যায়। একটি খাঁটি আধুনিক বাংলার ‘ল’, আর একটি আধুনিক বাংলার মাত্রাযুক্ত ‘ন’-র মতো। প্রথম শ্রেণীর ‘ল’ সংখ্যায় কম। পঞ্চাকার পুথিতে আধুনিক বাংলার ‘ল’ দেখা যাচ্ছে। কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও তাই। তবে ‘ন’-র মতো ‘ল’-ও আছে।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আধুনিক বাংলার ‘ল’ এবং ‘ন’-র মতো ‘ল’ দুই-ই পাওয়া যাচ্ছে।

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মাত্রাযুক্ত ‘ন’-কে ‘ল’-র জায়গায় ব্যবহার করবার রীতি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল।
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ‘ল’-কেও ‘ন’-র জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে চর্যার পুথিতে। তবে ‘ল’ এবং ‘ন’-র পার্থক্য স্পষ্ট; ‘ল’-য় মাত্রা আছে ‘ন’-য় মাত্রা নেই।

### শ

চর্যার পুথির ‘শ’ আধুনিক বাংলার মতো, দোপুঁটুলি আকারটি সুস্পষ্ট। এইরকম ‘শ’ পঞ্চাকার পুথির কয়েক জায়গায় আছে, তবে পঞ্চাকার পুথির অধিকাংশ ‘শ’ আকারে ‘ল’-র মতো। এইরকম ‘শ’ কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘শ’ চর্যার পুথির মতো।

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মিতাক্ষরা

### ষ

চর্যার পুথির ‘ষ’ আধুনিক বাংলার মতো পেট কাটা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তাই।

চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

লক্ষণীয় যে চর্যার পুথিতে মাঝের খাঁচটা ক্ষীণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্পষ্ট, নীচের বাঁকটি চর্যার পুথিতে কোণাকার, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অর্ধবৃত্তাকার।[২৩] চর্যার পুথির 'র' 'ব' 'খ' 'থ'-র তুলনায় 'ষ'-য় কোণগুলি স্পষ্ট নয়। পঞ্চাকার এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে কোণ স্পষ্ট।

ষ ষ

পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র

স

'স'-র আকার প্রায় সব পুথিতেই একরকম।

স স স স

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

হ

চর্যা, পঞ্চাকার, কালচক্রতন্ত্র—এই তিনখানি পুথির কোনোখানিতেই 'হ' আধুনিক আকার পায় নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আধুনিক বাংলার মতো 'হ' দেখতে পাওয়া গেল, তবে তখনও নিম্নগামী রেখাটি মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় নি।

হ হ হ হ

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যার পুথির কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন

কুং ষ্ণ স্ত্র ন্ত প্র ন্তৌ

৬

চর্যার পুথির অক্ষরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল আধুনিক বাংলা অক্ষর থেকে এই অক্ষরগুলির আকারগত পার্থক্য বেশি নয়। একমাত্র আদ্যাক্ষরে 'ই' ছাড়া এমন আর একটি অক্ষরও এই পুথিতে নেই যার বঙ্গীয়ত্বে সন্দেহ করা যায়।

আর একটি প্রসঙ্গ এখানে স্মরণীয় যে আধুনিক বাংলা অক্ষরের প্রত্যেকটির গঠনের সম্পূর্ণতা একই সময়ে হয় নি। কোনো কোনো অক্ষরের বিবর্তনে কয়েক শত বছরের ব্যবধান আছে ; অর্থাৎ 'ক' যদি আধুনিক

২৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ অক্ষরের যে অর্ধবৃত্তাকার বাঁক আছে তা যে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে চর্যা, কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও অনুরূপ অর্ধবৃত্তাকার বাঁক আছে— ষ ষ

রূপ পেয়ে থাকে নবম শতাব্দীতে, 'ই' আধুনিক রূপ পেয়েছে অনেক পরে। এই কথাটি মনে রাখলে চর্যার পুথির দু-একটি অক্ষরের বিচিত্র আকার বিভ্রান্তিকর মনে হবে না।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হবে এই অক্ষরগুলি কত পুরাণো, অর্থাৎ চর্যার পুথি লেখা হয়েছিল কবে।

অক্ষরের গঠন পরীক্ষা করে কোনো কোনো প্রাচীন পুথি বা অনুশাসনের লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু অক্ষর গঠন দেখে চর্যার পুথির লিপিকাল অনুমান করবার আগে বাংলা লিপির আঞ্চলিক প্রকারভেদ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া দরকার এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য বিস্তৃতাকারে জানা দরকার।

চর্যার পুথির উল্লেখযোগ্য লিপিগত বৈশিষ্ট্য এইগুলি—

১. দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ'

২. লেজকাটা 'ত' এবং 'ভ'

৩. 'অ'-র সংযোগ মাঝে,

৪. চৈতনহীন 'ট',

৫. 'য'-র সংযোগ উঁচুতে,

৬. 'ক'-র আঁকুড়ি লম্বা।

১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পঞ্চাকার পুথির সঙ্গে চর্যার লিপিগত সাদৃশ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কিছু অমিলও আলোচনা প্রসঙ্গে ধরা পড়েছে, যেমন 'ত', 'য', 'ভ', 'স' ইত্যাদি। পঞ্চাকার পুথির এই অক্ষরগুলি আধুনিক বাংলার বেশী কাছাকাছি। আবার, চর্যার পুথির 'দ', 'প', 'শ' অবশ্যই পঞ্চাকার পুথির তুলনায় আধুনিক। এই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য থেকে চর্যার পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বটে তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে চর্যার পুথিতে অধিকাংশ অক্ষরগুলির 'সংযোগ' নীচুতে নয়, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অ', 'থ', 'য', 'ব' ইত্যাদি। এটি প্রাচীনত্বের লক্ষণ। প্রাচীনত্বের আর পাঁচটি লক্ষণের কথা উপরে বলা হয়েছে। সেই কারণে আমার অনুমান চর্যার পুথি খুব সম্ভব পঞ্চাকার পুথির আগে লেখা হয়েছিল।

পঞ্চাকার পুথির লিপিকাল যদি যথার্থই ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে হয় তাহলে আমার অনুমান চর্যার পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ। মনে রাখতে বলি এ-অনুমান এক জোড়া চোখের সাক্ষ্যে এবং স্বল্পসংখ্যক পুথির ভিত্তিতে॥

# ডাকের বচন

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাংলাদেশে খনা ও ডাক বা ডাকপুরুষের বচন বলিয়া কথিত কতকগুলি সূক্তি প্রচলিত আছে। এগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকগণের জ্ঞাতব্য ও কর্তব্যবিষয়ক এবং আবহতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা ও শাকুনশাস্ত্রমূলক। সাধারণ জ্ঞানের কথাও এগুলিতে অনেক আছে।

এইরূপ সূক্তি অসমীয়া এবং মৈথিলী ভাষাতেও প্রচলিত আছে। কিন্তু আসাম ও মিথিলায় সমস্ত বচনই ডাক বা ডাকপুরুষের প্রতি আরোপিত হয়। পূর্বভারতের উল্লিখিত তিনটি অঞ্চলেই ডাককে জনৈক স্থানীয় জ্ঞানী জ্যোতিষী বলিয়া মনে করা হয়। তিন অঞ্চলেই তাঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিয়াছে।

খনার বচনের সংগ্রহমূলক বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ডাকের বাংলাবচনসমূহও কতিপয় গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সুশীলকুমার দে মহাশয়ের 'বাংলাপ্রবাদ' সংজ্ঞক সুবিখ্যাত পুস্তকে বহুসংখ্যক ডাক ও খনার বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে মুদ্রিত প্রমাণপঞ্জীটি খুব মূল্যবান্। বাংলাভাষায় ডাক ও খনার বচন সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দীনেশচন্দ্র সেন কৃত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বিশ্বকোষ', আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলা লোকসাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। অসমীয়া ডাকের বচনসমূহ সম্প্রতি দণ্ডীরাম দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অসমীয়া ভাষায় ডাকসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা ও উহার পরিশিষ্টের প্রমাণপঞ্জী, মহেশ্বর নেওগ মহাশয়ের 'অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। J. Christian রচিত Behar Proverbs সংজ্ঞক ইংরেজি গ্রন্থে বহুসংখ্যক মৈথিলীডাকের বচন উদ্ধৃত দেখা যায়।

উল্লিখিত তিনটি পূর্বভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে কেবল বাংলা দেশেই ডাক এবং খনা নামীয় দুইজন জ্যোতির্বিদের অস্তিত্ব কল্পনা করা হইয়াছে এবং কতকগুলি বচন ডাকের ও অপর কতকগুলি খনার রচনা বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু অনেকগুলি খনার বচন আসাম ও মিথিলায় ডাকের বচনরূপে প্রচলিত। আবার দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'ডাকপুরুষের কথা' গ্রন্থখানিতে কৃষিসম্বন্ধীয় যাবতীয় খনার বচনই ডাকের উক্তি বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমনকি সুশীলকুমার দে মহাশয়ের 'বাংলা প্রবাদে'ও দুইটি বচন ( নং ৬১২২ এবং ৭৯৮১ ) ডাক এবং খনা উভয়ের নামেই প্রচলিত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে, মূলতঃ বচনগুলি বাংলাদেশেও একই ব্যক্তির উক্তি বলিয়া চলিত। কিন্তু ডাককে পুরুষ এবং খনাকে নারী জ্যোতির্বিদ্ কল্পনা করার ফলে দুইটি স্বতন্ত্র কিংবদন্তী গড়িয়া ওঠার পর কতকগুলি বচন ডাকের এবং অপর কতকগুলি খনার উক্তি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতীয় সূক্তি হয় একজন মাত্র জ্যোতির্বিদের উক্তি অথবা অপর কোনো জ্যোতিষীকে উদ্দেশ করিয়া জ্যোতির্বেত্তা-বিশেষের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত হয়। খনার বচনের মধ্যেও কতকগুলি জ্যোতির্বিদ্ বরাহ বা মিহিরের প্রতি খনার উক্তি হিসাবে রচিত দেখা যায়। কতিপয় বচনে বরাহপুত্র ( মিহির ) কিংবা রাবণের ভণিতা আছে। অবশ্য বহুসংখ্যক ডাক বা খনার বচনে কোনোই ভনিতা নাই।

'খনা' ও 'ডাক' শব্দদ্বয়ের অর্থসম্পর্কে কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু কিংবদন্তীতে ডাককে পুরুষ এবং খনাকে নারী বলিয়া প্রচার করায় আসল কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় 'খনা' শব্দ সংস্কৃত 'ক্ষণদ' — প্রাকৃত 'খনঅ' অর্থাৎ গণৎকার হইতে উদ্ভূত। 'ডাক' শব্দটিকে আমরা 'ঘোষিত বাণী' এবং 'ডাকপুরুষ'কে 'বাণীঘোষণাকারী ব্যক্তি' অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতী। খনা ও ডাক যে ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, তাহার প্রমাণ আমরা পরে আলোচনা করিব। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও বলিয়াছেন, ডাক কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। তবে তিনি মনে করেন যে, একশ্রেণীর বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধককে ডাক বলা হইত। এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমরা পরে দেখিব যে, যে-অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কোনো প্রভাব বিস্তার করে নাই, সেখানেও ডাকের বচন জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

বাংলাদেশের কিংবদন্তী অনুসারে খনা নাম্নী মহিলা জ্যোতির্বিদ্ উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বরাহের পুত্র মিহিরের পত্নী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ উপকথাও বাংলায় প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার সমস্তই কাল্পনিক। কিংবদন্তীর রাজা বিক্রম অনৈতিহাসিক ব্যক্তি। অবশ্য উজ্জয়িনী অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নামের ভিত্তিতেই বাংলা কিংবদন্তীতে 'বরাহের পুত্র মিহির' কল্পিত হইয়াছেন। আমরা পরে দেখিব যে, এই ধরণের অমূলক জনশ্রুতি অন্যত্রও প্রচারিত আছে। যাহা হউক, পশ্চিম ভারতস্থিত উজ্জয়িনীবাসী জ্যোতিষীর পুত্রবধূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় সূক্তি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক হাস্যকর কল্পনা আর কি হইতে পারে? ডাক সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্যও অনুরূপ।

ডাকপুরুষের সম্বন্ধে পূর্বভারতে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। বাংলার প্রবাদে ডাক নামক জনৈক গোপজাতীয় ব্যক্তি ডাকের বচনের রচয়িতা। মিথিলার ডাকও গোপজাতীয়। কিন্তু আসামের ডাক কামরূপজেলার অন্তর্গত বরপেটার সাতমাইল দক্ষিণে অবস্থিত লোহিডঙরা (বর্তমান লোহগাঁও) নিবাসী জনৈক কুম্ভকার। তিনি নাকি উজ্জয়িনীবাসী জ্যোতির্বেত্তা মিহিরের বরে এক কুম্ভকারকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার একটি বচনে তাঁহাকে ব্রাহ্মণবংশীয়ও বলা হইয়াছে। এইরূপ অনৈক্য ব্যক্তিহিসাবে ডাকের অনৈতিহাসিকতা সূচিত করে। ডাক যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম হইত, তবে ডাকের বচন ভারতের আঞ্চলিক ভাষাবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু আমরা দেখিব যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের ঐ দেশত্রয় ব্যতীত অন্য কোনো কোনো অঞ্চলেও ডাকের বচন প্রচলিত আছে।

উত্তর প্রদেশে এই ধরণের সূক্তিগুলিতে 'ডাক'এর পরিবর্তে 'ঘাঘ'এর ভনিতা দেখা যায়। আসলে কিন্তু 'ঘাঘ' শব্দের অর্থ 'সুচতুর বৃদ্ধ বা জ্ঞানী ব্যক্তি।' ঘাঘের বচন সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে।[১] কোনো কোনো বচনে 'ভডরী'র উল্লেখ দেখা যায়। এই 'ঘাঘ' এবং 'ভডরী'র সহিত রাজস্থানী ভাষার সূক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। আবার রাজস্থানের কিংবদন্তী বাংলার ডাক ও খনার কাহিনীর উপর অনেকখানি আলোকপাত করে।

রাজস্থানের যোধপুরবাসী স্বর্গীয় জগদীশ সিংহ গহলোত মহাশয়ের 'রাজস্থানী কৃষিকহাবতেঁ' সংজ্ঞক গ্রন্থে বহুসংখ্যক ডাকের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। গহলোত মহাশয় যেমন পূর্বভারতে ডাকের অস্তিত্ব অবগত

১ সম্প্রতি ২০।৮।৬৪ তারিখের Statesman (কলিকাতা) পত্রিকায় এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মিথিলাতেও ডাকের বচনকে অনেক সময় ঘাঘের বচন বলা হয়।

ছিলেন না, তেমনি পূর্বাঞ্চলেও রাজস্থানী ডাকের কাহিনী অজ্ঞাত। এখানে বলা প্রয়োজন যে, রাজস্থানের ডাককে বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্যবিশেষ মনে করা কঠিন। কারণ ঐ অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই।

গহলোত মহাশয়ের গ্রন্থে খনা ও ডাকের বচনের অনুরূপ যে সূক্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলিতে ভনিতা আছে এবং উহাতে বলা হইয়াছে যে, ঐগুলি ভডলী বা ভড্ডলীর প্রতি ডংকের উক্তি। এই 'ডংক' যে আমাদের 'ডাক' তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ হিন্দীপ্রমুখ ভাষায় 'ডাকিনী'কে সাধারণতঃ 'ডংকিনী'ও বলা হইয়া থাকে। আবার রাজস্থানের ডাকোত সম্প্রদায়ের গ্রহাচার্যগণ আপনাদিগকে ডংকের বংশীয় বলিয়া দাবী করেন। 'ডাকোত' শব্দের অর্থ 'ডাকপুত্র' ( ডাকবংশোদ্ভব )। তবে 'ডংক' নামের সহিত 'ডংকা' ( নাগারা ) শব্দের সম্পর্ক আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় ডংকা বাজাইয়া ঘোষণা করা হইত, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

রাজস্থানী কিংবদন্তী অনুসারে ব্রাহ্মণবংশীয় ডংক মহাভারতপ্রসিদ্ধ রাজা পরিক্ষিতের আমলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ভিষগাচার্য ধন্বন্তরির কন্যা সাবিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সাবিত্রীর নামান্তর ভডলী বা ভড্ডলী। তিনিও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। আবার ইহাও বলা হয় যে, ডংক সুবিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা বরাহমিহিরের পুত্র। অবশ্য পরিক্ষিৎ, ধন্বন্তরি এবং বরাহমিহিরের সমকালীনতার কল্পনা নিতান্তই হাস্যকর।

গহলোত মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, ডাকোত গ্রহাচার্যেরাই আপনাদিগের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ডংক ও ভডলীর কাহিনী প্রচারিত করিয়াছে এবং জয়পুর অঞ্চলস্থিত সঙ্গনের নামক স্থানের ভডলী মেলার সহিত ডংকপত্নীর নামের সম্পর্ক রহিয়াছে। অবশ্য পূর্বভারত-প্রচলিত ডাকের কাহিনী লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ডাকোতেরা ডংককে কল্পনা করে নাই ; বরং ডাকোত নামটি ডংক বা ডাক নাম হইতে কল্পিত হইয়াছে।

রাজস্থানের গ্রহাচার্যদিগের ভডলী, গুরড়ে, থবরিয়া, শনিচরিয়া, দিশন্তরী, জোষী ( জ্যোতিষী ) প্রভৃতি নানা নাম আছে। এই 'ভডলী' সম্প্রদায়ের নাম হইতেই ডংকের পত্নীর নামকরণ হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। হিন্দী অভিধানে এই সাম্প্রদায়িক নামটি 'ভডুর' বা 'ভড্ডর' আকারে দেখা যায়। 'ভডলী' বা 'ভডরী' শব্দের অর্থ গণংকার বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত হিন্দী 'ভড়রিয়া' ( যাদুকর ) শব্দ তুলনীয়। যাহা হউক, যে প্রকারে 'খনা' নারী জ্যোতির্বিদ্‌রূপে কল্পিতা হইয়াছেন, ঠিক সেইরূপেই 'ভডলী' বা 'ভড্ডলী'কে জ্যোতিষিণী কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন খনা জ্যোতির্বেত্তা মিহিরের পত্নী, তেমনই 'ভডলী' বা 'ভড্ডলী' জ্যোতিষী ডংকের গৃহিণী। আবার মিহির এবং ডংক উভয়েই জ্যোতির্বিদ্ বরাহ বা বরাহমিহিরের পুত্র। প্রকৃতপক্ষে 'খনা' এবং 'ভডলী' ( বা 'ভড্ডলী' ) এই দুইটি শব্দেরই 'অর্থ গণংকার'।

নিম্নে আমরা গহলোত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে ডংকের ভনিতাযুক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম।—

১। পরভাতে গেহ ডংবরা সাঁজে সীলা বাব।
ডংক কহে হে ভড্ডলী কালা তণা সুভাব॥

ডংক কহিতেছেন, "হে ভড্ডলী, যদি প্রভাতে মেঘ সরিয়া যাইতে থাকে এবং সন্ধ্যাকালে শীতলবায়ু প্রবাহিত হয়, তবে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা।"

২। উগংতেরো মাছলো আথঁবতেরো মোখ।
ডংক কহৈ হে ভডলী নদিয়াঁ চঢ়সি গোখ ॥

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, "যদি প্রাতঃকালে রামধনু দেখা দেয় এবং সায়ংকালে সূর্যের কিরণ রক্তবর্ণ দেখা যায়, তবে নদীতে বন্যা আসিবে।"

৩। সাবণ পহিলী পংচমী ঝীনী ছাঁট পড়ৈ।
ডংক কহৈ হে ভডলী সফলা রূঁখ ফলৈ ॥

ডংক কহিতেছেন, "হে ভডলী, যদি শ্রাবণমাসের কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে বৃষ্টি হয়, তবে গাছে প্রচুর ফল ফলে।"

৪। ভাদরবে জগ রেলসী ছট অনুরাধা হোয়।
ডংক কহৈ হে ভডলী করো ন চিংতা কোয় ॥

ডংক কহিতেছেন, "যদি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠীতে অনুরাধা নক্ষত্র পড়ে, তবে দেশের সর্বত্র বৃষ্টি হয়। অতএব হে ভডলী, কোনো চিন্তা করিয়ো না।"

৫। চিত্রা দীপক চেতবে স্বাতে গোবরধন।
ডংক কহে হে ভডলী অথগ নীপজে অন্ন ॥

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, "যদি চিত্রা নক্ষত্রে দীপাবলী হয় এবং পরদিন প্রাতঃকালে গোবর্ধন পূজার সময় স্বাতীনক্ষত্র পড়ে, তবে দেশে প্রচুর শস্য জন্মে।"

৬। দিবা বীতী পংচমী সোম শুকর গুরু মূল।
ডংক কহে হে ভডলী নিপজে সাতুঁ তূল ॥

ডংক কহিতেছেন, "হে ভডলী, দীপাবলীর পর কার্তিক শুক্ল-পঞ্চমীতে যদি মূলা নক্ষত্রে সোম, বৃহস্পতি বা শুক্রবারের সংযোগ হয়, তবে সমস্ত রকমের ফসল প্রচুর জন্মে।"

৭। সুকরবাররী বাদরী রহী সনীসর ছায়।
ডংক কহে হে ভডলী বরস্যা বিনা ন জায় ॥

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, "যদি শুক্রবার আকাশে মেঘ দেখা দেয় এবং শনিবার পর্যন্ত উহা থাকে, তবে বৃষ্টিপাত না করিয়া উহা যাইবে না।"

৮। মাহ মংগল জেঠ রবী ভাদরবৈ সন হোয়।
ডংক কহে হে ভডলী বিরলা জীবৈ কোয় ॥

ডংক কহিতেছেন, "হে ভডলী, যদি মাঘমাসে পাঁচটি মঙ্গলবার, বা জ্যৈষ্ঠমাসে পাঁচটি রবিবার কিংবা ভাদ্রমাসে পাঁচটি শনিবার পড়ে, তবে ভীষণ দুর্ভিক্ষে সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

৯। সোমাঁ সুকরাঁ সুরগুরাঁ জে চংদো উগংত।
ডংক কহৈ হে ভডলী জলথল এক করংত ॥

ডংক ভডলীকে কহিতেছেন, "যদি আষাঢ়মাসে সোম, শুক্র কিংবা বৃহস্পতিবারে শুক্ল-প্রতিপদ্ তিথি পড়ে, তবে প্রবল বৃষ্টিতে জলস্থল একাকার হইয়া যায়।"

১০। পোহ সবিমল পেখজে চৈত নির্মল চংদ।
ডংক কহে হে ভডলী মন হুঁতা অন মংদ॥

ডংক কহিতেছেন, "যদি সমস্ত পৌষ মাস আকাশে ঘনমেঘ দেখা যায় এবং চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে আকাশ মেঘমুক্ত থাকে, তবে, হে ভডলী, টাকায় একমণেরও বেশি শস্যাদি বিক্রয় হইবে।"

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত ডাক( ডংক ), ঘাঘ, খনা প্রভৃতির বচনগুলি সংগ্রহ করিয়া কেহ যদি তুলনামূলক আলোচনা করেন, তবে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারে।

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা · বর্ষ ২১ সংখ্যা ২

পৃ ১১১ ছত্র ১৭ he was স্থলে he has

পৃ ১৪৯ বিনয়নী স্থলে বিনয়িনী

# সন্দেশরাসকম্ কাব্যসমীক্ষা

কালিকারঞ্জন কানুনগো

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সুপণ্ডিত মুনি জিনবিজয়, গুজরাট রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী "পাটন" (Anhilwarapattan) নগরীর জৈনগ্রন্থভাণ্ডার হইতে সন্দেশরাসকম্ কাব্যের এক প্রতিলিপি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই কাব্যের ভাষা সাধু অপভ্রংশ ভাষার "অপভ্রংশ" অর্থাৎ ঠেঠ, গ্রামীণ— যাহা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম-ভারতের লোক-ভাষা। মুনি জিনবিজয়ের সমকক্ষ অপভ্রংশবিদ্ পণ্ডিত সেকালে কেহ ছিলেন না। পুথির পাঠোদ্ধার এবং অর্থবিচার করিতে বসিয়া মুনিজী হতাশ হইলেন, এবং এই কার্যে সহায়তা প্রার্থনা করিয়া প্রতীচ্য পণ্ডিত হেরম্যান য়াকবী-র শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। পাটনের পুথিতে সন-তারিখ টীকা-টীপ্পনি কিছুই ছিল না। দেবসাগর (?) নামক কোনো ভট্টারকের শিষ্য মুনি মানসাগর উহার লিপিকার বা নকলনবীস।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জিনবিজয় পুনা ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউট্ পুথিশালায় সন্দেশরাসকম্ কাব্যের দ্বিতীয় প্রতিলিপি আবিষ্কার করেন। এই প্রতিলিপিতে মূল পাঠের সহিত সম্ভবতঃ কোনো ভিন্নব্যক্তি লিখিত অবচূরিকা নামক সংস্কৃত টীকা আছে। ইহার লিপিকার নয়সমুদ্র নামক জৈন সাধু। লিপিকার নিজের কোনো পরিচয় কিংবা স্থান সন তারিখ উল্লেখ করেন নাই।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মারবাড় রাজ্যের অন্তর্গত লোহাবত-নিবাসী জিন হরিসাগরজীর নিকট হইতে মুনি জিনবিজয় সন্দেশরাসকম্ কাব্যের এক তৃতীয় প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। এই প্রতিলিপিতে একটি ছোট সংস্কৃত টিপ্পনী আছে। এই টিপ্পনী পুনা-প্রতিলিপির টীকা অবচূরিকা হইতে কিঞ্চিৎ বিশদ, কিন্তু সংস্কৃত অত্যন্ত অশুদ্ধ। ইহার পুষ্পিকা (colophon) হইতে জানা যায় ইহার সংস্কৃত টীকাকার লক্ষ্মীচন্দ্র রুদ্রপল্লীয়গচ্ছ দেবেন্দ্র সূরির শিষ্য। লক্ষ্মীচন্দ্রের পিতার নাম হলিগ, মাতার নাম তিল্‌খু। লক্ষ্মীচন্দ্র হিসারদুর্গে বুধবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে লেখনকার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সালে লিখেন নাই। সুলতান ফিরোজ তোগলক পূর্ব পাঞ্জাবের হরিয়ানায় সুবিখ্যাত হিসার দুর্গ (পুরানাম হিসার ফিরোজা) নির্মাণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ তোগলক ১৩৫১ হইতে ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; সুতরাং সন্দেশরাসকম্ অন্ততঃ ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

উপরিলিখিত তিন প্রতিলিপির সাহায্যে মুনি জিনবিজয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যের প্রথম সংস্করণ (হরিবল্লভ ভায়ানী লিখিত বিশদ সমালোচনা সহ) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার কিছু পূর্বে শ্রীযুত অমরচাঁদ নাহটা সন্দেশরাসকম্ কাব্যের এক খণ্ডিত প্রতিলিপি (মাত্র সাত পৃষ্ঠা) বিকানীরে আবিষ্কার করেন। ইহাতে যে সংস্কৃত টীকা আছে উহা পুণা প্রতিলিপির অবচূরিকা-র অনুরূপ, কেবল ভূমিকার চতুর্থপাদের শেষে "কুরুতে মুনিপুঙ্গবঃ" স্থানে "কুরুতে লব্ধিসুন্দর" পাঠ পাওয়া যায়, সন তারিখ স্থান অন্য কিছুর উল্লেখ নাই।

প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার পনর বৎসর পরে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এবং শ্রীযুত বিশ্বনাথ ত্রিপাঠীর যুগ্মসম্পাদনায় এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য দ্বিবেদীজী

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যের এক দিগম্বর জৈন মন্দিরের পুথি-সংগ্রহের মধ্যে সন্দেশরাসকম্ কাব্যের পঞ্চম প্রতিলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুথির পত্র সংখ্যা ৩১; কিন্তু প্রারম্ভের দুই পাতা নাই। ইহাতে যে সংস্কৃত টিপ্পনী আছে উহা পুনা-প্রতিলিপির "অবচুরিকা-র সহিত হুবহু মিলিয়া যায়, অথচ উহার মূলপাঠ এবং টিপ্পনীর মধ্যে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা যায়। সম্পাদক দ্বিবেদী মন্তব্য করিয়াছেন,—"ইহাতেই বুঝা যায় লিপিকার এক পুথি হইতে মূলপাঠ এবং অন্য কোনো পুথি হইতে টীকা নকল করিয়াছেন··· এই টীকার কি নাম এবং উহার লেখক কোন ব্যক্তি কিছু নির্দ্ধারণ করা যায় না।" [ প্রস্তাবনা, পৃ ২] জয়পুর-প্রতিলিপির অবচূরী নামকরণ করিয়া দ্বিবেদীজী উহা দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপাইয়াছেন। এই অবচূরী-র শেষে লিখিত আছে—

সং ১৬০৮ বর্ষে বৈশাখ সুদি ১৪ রবিদিনে শ্রীসরস্বতী পত্তনে পাতিসাহ শ্রীইসিলেম স্যাহি বিজয়রাজ্যে। শ্রীবৃহদ্গচ্ছগগনাংগণ ভাস্করাণাং পূজ্যারাধ্য শ্রীশ্রীউদয়রাজ্য সুরীন্দ্রানাং বিজয় রাজ্যে। পূঃ শ্রীশ্রীসংযম রাজ সুরি শক্রাণাং বিনয়েন বাচনার্থং শ্রীমাণিক্যরাজ মিশ্রবরৈ আলিখ্য স্বপঠনায় বিচার-চতুরৈঃ সুযুক্তা শোধ্যং। যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া। যদি শুদ্ধমুদ্ধং বা মমদোষো ন দীয়তাং··· [ বি. সম্বত ১৬০৮ ( ১৫৫২ খ্রীঃ ) বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে রবিবারে শ্রীসরস্বতীপত্তনে শ্রীইসলাম শাহর ( শেরশাহ-র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ) রাজত্বকালে···শ্রীউদয়রাজ্যসুরির সময়ে পূজ্য শ্রীশ্রীসংযমরাজ সুরির অধ্যাপনার জন্য শ্রীমানিক্যরাজ মিশ্রের দ্বারা লিখিত। বিচার-চতুরগণ নিজে পড়িবার সময় ইহা সুযুক্তি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। পুস্তকে যে প্রকার লিখিত আছে আমি সেরকম লিখিয়াছি। শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য আমাকে দোষ দিবেন না ]

এই "সুযুক্ত্যা শোধ্যম্" অধিকার সম্পাদক, সাহিত্যিক, গবেষক এবং সমালোচকগণ গত বিশ বৎসর যাবৎ এই সন্দেশরাসকম্ কাব্যের উপর নির্বিবাদে চালাইয়াছেন। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পড়িয়া মনে হইল, যাহা পূর্বে লেখা হইয়াছে উহার মধ্যে "শোধ্যম্" অনেক কিছু এখনও রহিয়াছে। সন্দেশরাসকম্ কাব্যের সমালোচনায় মধ্যযুগের ইতিহাসজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই কাব্যের পূর্ববর্তী সমালোচকগণ ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে অপরাজেয়; কিন্তু উঁহাদের মধ্যে ইতিহাস হয়তো কাহারও উপজীবিকা নহে। মধ্যযুগের ইতিহাস কোনো কোনো স্থানে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে, অনেকে খোলামন লইয়া বিচার করেন নাই। এই প্রবন্ধে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব—

১. সন্দেশরাসকের রচয়িতা কি কোনো ধর্মান্তরিত তন্তুবায় পুত্র ?

২. এই কাব্যের টীকাকার ও লিপিকার সকলেই জৈন পণ্ডিত এবং জৈন পণ্ডিতেরাই এই কাব্যের পঠন-পাঠন কেন করিতেন ?

৩. এই কাব্যের পটভূমি কোথায় ?

৪. দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েকটা বিবদমান সিদ্ধান্ত।

৫. কাব্যের আনুমানিক রচনা কাল।

এই কাব্যের "কথাবস্তু" ব্যতীত উপরিলিখিত বিষয়-বিচারে বিশেষ কোনো বহিপ্রমাণ নাই। এই বিতণ্ডায় উভয়পক্ষের কথাবস্তু হইতেই সুযুক্তিগ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে এই কাব্যের সারাংশ বাঙালি পাঠককে প্রথমে নিবেদন করা হইল।

সন্দেশরাসকম্ শৃঙ্গাররসাত্মক দূতকাব্য। এই কাব্যের অনামিকা নায়িকা গতানুগতিক রাজকন্যা নহেন; কাব্য পড়িয়া মনে হয় তিনি প্রোষিত-ভর্তৃকা সমৃদ্ধ বণিকপত্নী। এই কাব্যে নায়িকার দূত মেঘ, পবন, হংস কিংবা বিনয়পত্রিকাবাহক দরদী মানুষ নহে। দূত মূলতানবাসী এবং নায়িকার সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী পথিক। নায়ক অর্থাৎ নায়িকার স্বামীর নাম অজ্ঞাত। এই কাব্যের কথা সমাপ্তির ঠিক পরেই কেবলমাত্র রসভঙ্গ করিবার জন্যই অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার উপস্থিতি।

১. কথাবস্তু-সার[১]

[ স্থান পশ্চিম-ভারতের কবি-কল্পিত বিজয়নগরের রাজপথ। সময় পরিণাম-রমণীয় কোনো অজ্ঞাত গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ ]

সূর্যদেব পাটে নামিয়াছেন। বিজয়নগরবাসিনী কোনো এক বরবর্ণিনী পথের দিকে চাহিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত আয়তলোচনদ্বয় দ্বারা প্রবাসী পতির আগমনপথ যেন পরিমাপ করিতেছেন। মরালগামিনী অতিক্ষীণ-মধ্যমা সুন্দরীর কুচদ্বয় স্থূল স্থিরোন্নত। তাঁহার কাঞ্চনগৌর দেহকান্তি দীর্ঘ বিরহাগ্নির ধূমশিখায় পূর্ণগ্রাস-কবলিত শশীকলার ন্যায় শ্যামায়মানা; পাণ্ডুর মুখশ্রীর উপর অসম্বৃত অলকগুচ্ছ সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় নামিয়া আসিয়াছে; দীননয়না দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া নিজের আঁচলে ধারাবর্ষী নয়নদ্বয় মুছিতেছেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন দূরে বহুদূরে বিপরীত দিক হইতে [ উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ] একজন পথচারী যেন বাতাসে ভর করিয়া ঐ পথে আসিতেছেন, পথিকের পা দুইখানা যেন মাটি শুধু ছুঁইয়াই আছে। পথিককে দেখিয়া রোরুদ্যমানা সুন্দরী আত্মহারা হইয়া আলুথালু দৌড় দিলেন। দ্রুত দোদুল্যমান শ্রোণীভারে তাঁহার কিঙ্কিণীমুখরিত বিপুল নিতম্বলম্বিনী মেখলা দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। শক্ত গাঁট দিয়া ছিন্ন মেখলা বাঁধিয়া আবার দৌড়াইতেই উৎকণ্ঠিতার নয় লহরের মুক্তামালা ছিঁড়িয়া গেল। অধীরা বিরহিণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুক্তা কিছু কুড়াইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কিছু ফেলিয়াই আবার পথিকের দিকে ছুটিলেন; কয়েক পা যাইতে না যাইতে নূপুর পায়ে প্যাঁচ খাইয়া পদাধিকারিণীকে সটান ভূপাতিত করিল। লজ্জারুণা অথচ সপ্রতিভ রমণী উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার মাথার ওড়না উড়িয়া গেল। মাথার ওড়না ঠিক করিয়া মুগ্ধা আবার চলিলেন; এবার দেখা গেল বুকের রেশমী চোলী ফাটিয়া স্থূল স্তনদ্বয় বাহিরে প্রকাশমান। সলজ্জভাবে কোনোরকমে দুই হাতে উহা ঢাকিয়া নায়িকা দ্রুত চলিতে লাগিলেন যেন দুইটি স্বর্ণকমল কনক-কলসীদ্বয়কে ঢাকিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। পথিকের নিকটবর্তী হইয়া সাশ্রুনয়না করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "দাঁড়াও পথিক! দয়া করিয়া আমার দুইটা কথা শুনিয়া যাও।"

নারীকণ্ঠের আর্তস্বর শুনিয়া পথিক কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। কুচভিন্ন-চোলিকা, খণ্ডিত-রশনা, ব্রীড়ানত-মুখী রোরুদ্যমানা অনিন্দ্যসুন্দরীকে সম্মুখে দেখিয়া পথিকের "ন যযৌ, ন তস্থৌ" অবস্থা হইল। পথিক মূলতানবাসী বিদগ্ধ নাগর। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বগত একটি দোহা আবৃত্তি করিলেন—"পুষ্পধন্বার অমোঘ শায়ক তুল্য এ হেন লাবণ্যপুঞ্জাকে যিনি সৃষ্টি করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন না, সেই বিধাতাপুরুষ কি অন্ধ? না কি ক্লীব?"

ইহার পর পথিক উচ্চস্বরে এক গাথাষ্টক সুন্দরীকে শুনাইলেন—…শৈলজা পার্বতীকে সৃষ্টি করিবার পর বিধাতা সেই ছাঁচে কিঞ্চিৎ পারিপাট্য করিয়া [ সুসবিসেসং ] এই বরাঙ্গযষ্টি নির্মাণ করিয়াছেন। স্বয়ং

১. ভাষা যথাসম্ভব মূল অপভ্রংশের বাংলা ভাবানুবাদ।

প্রজাপতি যখন সৃষ্টিকার্যে পুনরুক্তিদোষমুক্ত নহেন, কবিগণের "পুনরুক্তিদোষ" কেমন করিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে?

এই রূপ-প্রশস্তি শুনিয়া লজ্জারুণা নায়িকা অধোবদনে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন, (লক্ষণ ভালো নহে)। তিনি পথিককে আরও নিকটে ডাকিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিক! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? এখন কোথায় যাইবে?"

পথিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিজের শহর মুলতানের প্রশংসা নায়িকাকে শুনাইতে লাগিলেন।—

"অয়ি কমলদলনয়নে! আমার নিবাস সামোর [শাম্বপুর, মুলতান] ঐ নগরে সকলেই পণ্ডিত ও বিদগ্ধনাগর, গ্রামীণ মূর্খ কেহ নাই। এই নগর তুঙ্গ-ধবলপ্রাকারবেষ্টিত এবং সুরম্য ত্রিপুর-তোরণমণ্ডিত [তিউরি;হিন্দী ত্রিপোলিয়া]। নগরে প্রবেশ করিলেই মধুর প্রাকৃত ছন্দ শ্রুতিগোচর হয়। কোনো স্থানে "চৌবে" (চতুর্বেদী) ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেছেন, কোথায়ও বা মহাভারত নলচরিত ইত্যাদি পাঠ হইতেছে; কোনো জায়গায় দ্বিজবর আশীর্বাদ দিতেছেন, অন্যত্র নিপুণ- নট রামায়ণ অভিনয় করিতেছে; কেহ কেহ বাঁশি বীণা ইত্যাদির বাজনা শুনিতেছে; কোনো স্থানে পথিমধ্যে "সুসমত্ত" উদ্ভিন্নযৌবনা নর্তকীগণের চঞ্চল বসনোত্থিত "চল্ল চল্ল" ধ্বনি বিলাসী নাগরের দেহ মন চলায়মান করিতেছে।

(মুলতান) নগরের "বেশবাড়া"-তে প্রবেশ করিলে অতি সুস্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তিও ব্যামোহগ্রস্ত হয়। রূপের হাটে গজেন্দ্রগামিনী কোনো নর্তকী শরাবের নেশায় ধীরমন্থর গতিতে চলিয়াছে, ক্রীড়াচ্ছলে অন্য নর্তকীর মোতির ঢুলে দোল দিতেছে। কোনো সুন্দরীর সঞ্চারমান ক্ষীণকটি তাঁহার অতিপ্রকট ঘনতুঙ্গ বক্ষস্থলের ভারে কেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না— দেখিলে মন বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে। কোথায়ও দেখা যায় কোনো যৌবনমদমত্তা পথিমধ্যে কোনো কৃতার্থ পুরুষের উপর তীক্ষ্ণ তির্যক্ চাহনি হানিয়া কৃত্রিমকোপের তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক বিদ্রূপের ক্ষীণ হাসি হাসিতে হাসিতে আলাপনিরতা। অন্য লাস্যময়ী "সুবিচক্ষণা" যখন প্রাণভরা বিমল হাসি বিতরণ করেন, তখন তাঁহার শশীপ্রভ কপোলপ্রদেশ রবিকিরণোজ্জ্বল হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া চন্দ্রমা মধ্যাহ্ন সূর্যবৎ প্রতীয়মান হয় (প্রভাবিশেষোদয়ে?) [সসি সূর নিবেসিয়]। রূপের হাটে কোনো রাজহংসগামিনীর অতি মন্থর সাবলীল পাদন্যাসে, বিকট-নিতম্বার গুরুশ্রোণীভারে ক্লিষ্ট কণ্ঠরুদ্ধ চর্মপাদুকার মচ্ মচ্ শব্দ পর্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কোনো সুদন্তী সুভাষিণীর কথা বলিবার সময় তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত হীরক পঙক্তি সদৃশ দন্তরাজি রক্তদন্তিকার আরক্তিম আভা বিকীর্ণ করিতেছে… "বেসবাড়া" নূপুরের ঝঙ্কারে মেখলার রণুঝুনু রবে বার-নারীর মতোই যেন মুখরা। সেখানে কোনো নর্তকীর লীলাচঞ্চল পাদন্যাসজনিত চর্মপাদুকার "চিক্কণ" (বাং কেঁচ কেঁচ) রব [চিক্কণরউ চম্বাইহি] নব শরৎসমাগমে সারসীর করুণ মধুর ধ্বনির ন্যায় নাগরজনের চিত্ত আকুল করিতেছে। সেখানের পথ সুন্দর মুখনিসৃত পানের পিকে পিচ্ছিল; কান্তা মুখশ্রীর রূপের ধাঁধায় দিশাহারা পথিক পা পিছলাইয়া উহাতে গড়াগড়ি দেওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা। পদস্খলনের পরেও যদি কাহারও ভ্রমণের অভিলাষ থাকে, তিনি (মুলতান) শহরের বাহিরে দশযোজন ব্যাপী উদ্যানপরম্পরার ছায়াঘন বীথির অন্তরালে সারা সংসার ভুলিয়া থাকিতে পারেন।…

[উদ্যানের গাছপালা পৃঃ ১৫-১৭]

[এই নগরের] তপনতীর্থ নাম প্রসিদ্ধ। পৃথিবী-মধ্যে এই নগর মূলস্থান নামে পরিচিত। ঐ স্থান

হইতে আমার মুনিবের হুকুমে তাঁহার গোপনীয় সাংকেতিক বার্তা লইয়া আমি খাম্বাত ( Port of Cambay ) যাইতেছি।”

২

পথিকের মুখে “খাম্বাত” নাম শুনিতেই নায়িকা বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কান্নার পরে সাশ্রুনয়না সুন্দরী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, ‘পথিক্! খাম্বাত নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার ধূমায়িত বিরহাগ্নিতে ফুংকার দিয়াছে। যদি আধাক্ষণ পা গুটাইয়া বস তাহা হইলে সংক্ষেপে প্রিয়তমের কাছে সন্দেশ নিবেদন করিতে পারি; দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে, প্রবাসী প্রিয়তম বাড়ি ফিরে নাই।

[ সুন্দরীর সাশ্রুকাকুতি পথিককে পথে বসাইল। অতঃপর নানা ছন্দে বিরহিণীর দুঃখ নিবেদন ]··· প্রিয়তমকে বলিও, এক হাতের বালার মধ্যে আমার দুই হাত ঢুকিয়া যায়, কড়ে আঙ্গুলের আংটি “বাহুটী” ( armlet ) হইয়া গিয়াছে···’ [ ইহার পর সংবাদ মারফত কখনও করুণ আবেদন, কখনও শবর, শঠ, কাপালিক ইত্যাদি গালাগালি ]

দরদী পথিক বিদেশিনীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “অয়ি আয়তাক্ষি! প্রবাসী পুরুষ বিবিধ কার্যে বিদেশে যায়, এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে, নিজের উদ্দেশ্য সফল না করিয়া ফিরে না। হে মুগ্ধে! বিরহকাতর প্রবাসীও গৃহিণীকে স্মরণ করিয়া তোমার মতো দিন দিন ক্ষীণ ও খিন্ন হয়।··· বারবার চোখের জল ফেলিয়া আমার পথযাত্রায় অমঙ্গল করিও না··· যাহা বলিবার আছে শীঘ্র বলিয়া ফেলো। দিন ডুবিয়াছে, আমাকে বিদায় দাও।” সজলনয়নে সুন্দরী পাণ্টা আবদার করিয়া বসিলেন, “পথিক্, যাইবার কথা এখন ছাড়ো। এইখানে রাত্রি যাপন করিয়া কাল ভোরে চলিয়া যাইও। যদি থাকিতে না পার এই কয়টি “গাথা” শুনাইয়া দিও।”

[ কিন্তু নায়িকার কথা ফুরাইতে চায় না; পূর্বদিকে আঁধার নামিয়াছে, রাস্তা দুর্গম ও ভয়বহুল, রাত্রে চলা যায় না; কাজ কিন্তু অতি জরুরি—ইত্যাদি পথিকের কোনো অজুহাত টিকিল না। বিঘোরে পড়িয়া বিরহিণীর মুখে গোটা বারমাসা[২] শুনিবার পর পথিক কষ্টে রেহাই পাইলেন ]···

“হে পথিক! গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে প্রিয়তম যেদিন প্রবাস যাত্রা করিলেন, সেদিন যখন আমি তাঁহাকে শেষ প্রণাম করিলাম তখন [ আমার ] সুখও আমাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গিয়াছে।··· গ্রীষ্মের তাপে [ এঁটেল ] মাটি চড়্‌চড়্ [ মূল “তড়্‌তড়্” ] করিয়া ফাটিয়া যায়; বিরহিণীর বুক ফাটে, কলিজা ফাটে না। “আঁধি”-র [ ভুঁড্যালক ] গরম বাতাস বিরহিণীর গায়ে লাগিলে আঁধিই জ্বালায় অস্থির হয়। আকাশে নূতন মেঘের আশায় চাতক “পিউ পিউ” ডাকে। গ্রীষ্মে আম্রবৃক্ষের শোভাসম্পদ ও আনন্দ বিরহিণীর ঈর্ষার উদ্রেক করে। ফলের ভারে গাছ নুইয়া পড়িয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি আসিয়া গাছে বসে, পাতার আড়ালে ডালে ডালে দোল খায়, টেঁ টেঁ করে। চাঁদের আলো, শীতল চন্দন, সুখ-স্পর্শ মুক্তার হার কিংবা পঙ্কজমালা বিরহের তাপ উপশম না করিয়া বরং দ্বিগুণিত করে; যেহেতু রবিপ্রিয়া

২. ষড়্‌ঋতু বর্ণনা

কমলিনী সংসর্গদোষে জ্বালাদৃপ্তা, মহাবিষের অগ্রজন্মা শশীকলার শীতরশ্মি বিষদিগ্ধ, ভুজঙ্গালিঙ্গিত হরিচন্দন বিরহরোগীর পক্ষে ঠাণ্ডা বিষ, লবনাম্বুপোষিত মুক্তাফলের স্পর্শ কন্দর্পবাণের ক্ষতের উপর ক্ষারপ্রক্ষেপ মাত্র।

বর্ষা নামে, কিন্তু প্রিয়তম ফিরে না ; প্রাবৃটের ঘোরঘটা আঁধার মনে দ্বিগুণ নিরাশার সঞ্চার করে। মেঘসমাগমে ধরিত্রী অভিনব অভিসার-সজ্জায় সাজিয়াছেন। ধরাবধূর অঙ্গে ইন্দ্রগোপ-খচিত [ বর্ষার লালপোকার ঝাঁক ] রক্ত দুকূল ; শুভ্র কর্দম-লেখা কপোলে চন্দনপত্রক রচনা ; কদম্বপুষ্প শ্যামাঙ্গিনী বসুধার দেহসুরভি। আমি রাত্রিকে মনের কথা শুনাইয়া বলি, 'হে যামিনী! দুঃখের দিনে তুমি চতুর্গুণ বাড়িয়া থাক, কিন্তু সুখের সময় ছোট হও।'

বর্ষার জল পথিপার্শ্বের জলাশয় ভাসাইয়া পথঘাট ডুবাইয়াছে, পথচারী পায়ের জুতা হাতে লইয়া চলিতেছে ; ভরা নদী দুস্তর খরস্রোতা। [ গৃহমুখী ] প্রবাসী চারিদিকে আট্‌কা পড়িয়াছে। কাজের তাগিদে কাহারও কোথায় যাইতে হইলে পায়ে হাঁটিয়া কিংবা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার যো নাই, নৌকাই ভরসা।··· সাপগুলি গর্ত হইতে উঠিয়া পথ বিপদসঙ্কুল করিয়াছে··· মশার ভয়ে গরুগুলি ডাঙ্গা জমিতে আশ্রয় লইয়াছে।

অগস্ত্যোদয়ে শরৎসমাগমে আকাশে, বাতাসে, সরোবরে, নদীতটে সর্বত্র আনন্দের শুভ্রহাসি। মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র-তারকার হাসি, জলাশয়ে উৎফুল্লা নলিনীর হাসি, নদীতীরে সঘন কাশবনের হাসি। গৃহস্থের ঘরে ঘরে রূপের খেলা, ক্রীড়ার লাস্য, সংগীতের আনন্দহিল্লোল। স্বামীসোহাগিনীগণ বিবিধ অলঙ্কারে সাজিয়া নানা রংএর ছাপা শাড়ি পরিয়া রাসনৃত্যগীত করিতেছে, ঘরে ঘরে ঢোলক বাজিতেছে, স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গে সরোবরের শোভা দেখিতেছে, যুবকেরা খেলিতেছে, বালকেরা খেলা দেখিতেছে। তরুণীগণ রূপের ঢেউ তুলিয়া, বিবিধ বাজনা বাজাইয়া, কুণ্ডলাকারে নাচিতে নাচিতে অলিগলি ফিরিতেছে।

দীপাবলী অমাবস্যায় স্ত্রীলোকেরা দীপ দান করে, নূতন দীপ জ্বালাইয়া ঘর সাজায়, বিবিধ ভঙ্গীতে "বহুবিধ কুটিল তরঙ্গে শোভমান্ কৃষ্ণাম্বর" [ শাড়ি ? না লেহেঙ্গা ? ] পরিধান করে ; সীমন্তে সাদা ফুলের মালা পরিয়া কৃষ্ণবসনা সুন্দরীগণ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত তোরণের শীর্ষদেশে চন্দ্রোদয়ের বিভ্রম সৃষ্টি করে।···

হে পথিক! যে দেশে প্রিয়তম প্রবাস করিতেছে সেই দেশের চাঁদে কি জ্যোৎস্না নাই? হংস পদ্মবীজ ভক্ষণ করিয়া সেই দেশে কলরব করে না? কেহ কি মধুর স্বরে সুললিত প্রাকৃত ভাষায় বাক্যালাপ করে না? কিংবা প্রত্যুষে শিশিরসিক্ত সঘন কুসুম-সুষমা চতুর্দিক গন্ধে আমোদিত করে না?

উৎকণ্ঠায় অধীর চিত্তে অপেক্ষা করিতে করিতে কুয়াসার [ ওড়না ] উপঢৌকন লইয়া হেমন্ত উপস্থিত হইল। এই ঋতুতে প্রসাধনের জন্য স্বৈরন্ধ্রীগণ অভিসারিকার জন্য কর্পূরের সহিত চন্দন পিষে না, অধর ও কপোল রাগের সহিত মোম মিলায়। লোকে এই সময়ে কস্তুরীর সহিত চাঁপাফুলের তেল সেবন করে, জায়ফলের সঙ্গে কর্পূর কিংবা সুপারির সহিত কেয়া ফুলের নির্যাস [ কেওড়া ] তাম্বুলবিলাসীরা বর্জন করে। রাত্রে স্ত্রীলোকেরা ছাদে বিছানা করে না, ঘরের বারান্দায় শুইতে আরম্ভ করিয়াছে।··· দৈর্ঘ্যে হেমন্তের দিন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ; কিন্তু অভাগিনীর পক্ষে এ হেন একটা দিনও যেন ব্রহ্মার একটি যুগ।··· [ প্রিয়তমের প্রতি ] রে মূর্খ! খল! পাপী! তবে কি তুই আমার মরণের খবরের জন্য বসিয়া আছিস?

শীতকাল আসিল ; কিন্তু ধূর্ত [ প্রণয়ী ] এখনও দূরে দূরে ঘুরিতেছে। শীতের কন্‌কনে দম্‌কা বাতাসে গাছে পাতা নাই, ফুল নাই, ফল নাই, পাখিও নাই, বাগানে ফুলের কেয়ারী আধমরা হইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে।

লুব্ধ প্রণয়ীজনকে শিলাশীতল কেলিগৃহে বসাইয়া রাখিয়া বিলাসিনীগণ অগ্নিগৃহে তাপ সেবন করে। মদ্যপায়ীরা মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছে। এবং বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত "রস" [ ইক্ষুরস ? ] পান আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা রসিক তাঁহারা অর্ধাবর্ত [ আধপেড়া ] ইক্ষুরস সেবন করিতেছেন। সীমন্তিনীগণ কুন্দচতুর্থী তিথিতে বাসর শয্যারচনা করিতেছেন [ বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপনার্থ ? ]। কোনো রমণী ঋতুরাজ বসন্তের জন্মদিনে [ মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ] দান দিতেছেন।

মাদৃশা মুগ্ধা অভাগিনী প্রিয়তমকে ফিরাইয়া আনিবার আশায় "মনোদূত" পাঠাইয়াছিল। [ হতভাগা ] মন আমার কাজ ভুলিয়া প্রিয়তমের কাছেই পড়িয়া রহিল! কানকাটা গর্দভীর[৩] মতো আমি এখন অনুশোচনা করিয়া মরিতেছি [ প্রিয়তম মনটাকে ভাগাইয়া লইলেন, লাভের বদলে ক্ষতিই কপালে রহিল ]।

বনের ঘাস পর্যন্ত জ্বালাইয়া শীত অবশেষে বিদায় হইয়াছে। বিরহিণীর ধূমায়মান মদনাগ্নিতে মলয়সমীরণ নিরন্তর ফুংকার দিতেছে।...... বৃক্ষসমূহ মধুমাস-লক্ষ্মীর জন্য নবকিশলয় শয্যা রচনা করিতেছে, ভ্রমর মৃদুগুঞ্জনে বসন্তের আগমনী গাহিতেছে। শ্বেতরক্ত পুষ্প-লাঞ্ছিত বিচিত্রবসনা কামিনীগণ সখীপরিবৃতা হইয়া বসন্তসংগীতে মাতিয়া উঠিয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট কণ্টক পত্রান্তরে প্রচ্ছন্ন কেতকী-কোরকের গন্ধে আকৃষ্ট রসিক ভ্রমর বিফল চেষ্টায় ক্ষোভ ভরে গুন গুন করিতেছে, কেয়া পাতার কাঁটায় পাখা ক্ষত-বিক্ষত হইলেও মরিয়া হইয়া আবার পথ খুঁজিতেছে। রসলুব্ধ যথার্থ প্রেমিক ঈপ্সিত প্রাপ্তির পথে দেহবিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, প্রেমের [ কামের ? ] মোহে পাপকে পাপ মনে করে না।...

বসন্ত ঋতুতে বাড়বাগ্নির উত্তাপে সমুদ্র আকুল হইয়া গর্জন করে, ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল ও দুর্বার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তবুও লাভের আশায় বণিকেরা ভয় বিপদ তুচ্ছ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করে। প্রেমের দুর্গে সুরক্ষিত আমার স্বামীও নির্ভয়ে নিরাপদে বাণিজ্য [ সামুদ্রিক ] করিতেছেন।...

শিমুল গাছ লালে লাল হইয়া গিয়াছে যেন গাছের উপর রক্তবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পলাশ সাক্ষাৎ "পলাশ" [ মাংসাহারী রাক্ষস ] হইয়াছে, সজিনা [ সইজন্ ] অসুখের কারণ হইয়াছে... অশোক বৃক্ষকে "অশোক" নাম মিথ্যা দেওয়া হইয়াছে, ক্ষণেকের জন্য উহা বিরহিণীকে শোকরহিত করে না; [মাধবীলতার] "সহকার" [ আম্রবৃক্ষ ] বিরহবিমর্দিত অঙ্গলতাকে আশ্রয় [ হিঃ সহরা ] দেয় না... নিবিড় নিরন্তর পল্লবস্নিগ্ধ পাটল উন্নতশীর্ষ আম্রবৃক্ষসমূহ আকাশে বসন্তশ্রীর জন্য আসন পাতিয়াছে। কৃষ্ণকোকিল "সুরক্তক" [ আম্র ? ] বৃক্ষের উপর বসিয়া ভরতমুনির শিষ্যের মতো বিশুদ্ধ তানলয়ে গান ধরিয়াছে। বসন্ত আসিয়াছে; শুকদম্পতি সুখের আশায় নাচিয়া নাচিয়া নীড় নির্মাণ করিতেছে। যৌবনমদমত্তা তরুণীগণ লাস্যচেষ্টিত অঙ্গভঙ্গি করিয়া চতুষ্পথে "চর্চরী" [ হোলির নাচ ] নৃত্যে মাতিয়াছে; তাহাদের মেখলালম্বিত কিঙ্কিনী সমূহ হাততালির সহিত তাল মিলাইয়া রুণুঝুণু ধ্বনি করিতেছে।...

পথিক! অতিদুঃখে আমার মুখ দিয়া যাহা কটূক্তি বাহির হইয়াছে ঐ গুলি বাদ দিয়া বিনয়-সন্দেশ প্রিয়তমকে এই ভাবে নিবেদন করিবে যেন তিনি রাগ না করেন।"

---

৩ লোককে গুঁতাইবার জন্য এক গর্দভী এক জোড়া শিং প্রার্থনা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট ধর্ণা দিয়াছিল। পিতামহ তাহাকে শিং দিলেন না; অধিকন্তু তাহার দুই খানা কান কাটিয়া রাখিয়া বিদায় দিলেন। গর্দভী হায় হায় করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। পরে অবশ্য ব্রহ্মা তাহাকে ডবল সাইজের দুখানা কান খয়রাত করিয়াছিলেন।— ইতি পশ্চিম ভারতীয় পৌরাণিকী শ্রুতি।

নায়িকা পান্থদূতকে বিদায় দিয়া ঘরমুখী হইলেন এবং দক্ষিণ দিকে রাস্তার মোড় ঘুরিতেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার স্বামীও বাড়ির দিকে আসিতেছেন।

ক্ষণার্ধের মধ্যে নায়িকার যেমন অচিন্ত্য মহতী সিদ্ধিলাভ হইল, যাঁহারা এই "রাসক" পাঠ কিংবা শ্রবণ করিবেন তাঁহাদেরও অনুরূপ কার্যসিদ্ধি হউক্! অনাদি অনন্ত অনাগত কালের জয় হউক্!

**(ক) "বিজয়নগর" কোথায়?**

সন্দেশরাসক প্রেমগাথার নায়িকাকে কবি বলিয়াছেন, "বিজয়নগরের কোনো এক বররমণী"। কিন্তু টীকাকার বিজয়নগরকে "বিক্রমপুর" করিয়াছেন— "সা বিক্রম পুরাং কাচিদ্দুরনায়িকা"। টীকাকার কেন ইহা করিলেন? পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৪০৮ খ্রীঃ) লক্ষ্মীচন্দ্র নামক জৈন সাধু সন্দেশরাসকের প্রথম টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, এই কাব্যের কোনো বৃত্তি টীকা ইত্যাদি নিজের চোখে দেখেন নাই; কিংবা কোনো গুরুর নিকট হইতে এই কাব্যের পাঠ গ্রহণ করেন নাই; কিংবা স্বয়ং গ্রন্থকর্তার মুখে এই কাব্যের পাঠ এবং ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগও তাঁহার ঘটে নাই। ক্ষত্রিয় গাহড়ের মুখে এই কাব্যের ভাবার্থ যাহা কবি শুনিয়াছেন উহাই ঠিক তেমনি রাখিয়াছেন।··· কোনো দোষ ভুল ভ্রান্তি যদি কিছু টীকায় ধরা পড়ে ঐ গুলির জন্য দোষী তিনি নহেন, সত্যমিথ্যা গাহড় ক্ষত্রিয়ই জানেন। সুলতান ফিরোজ শাহর রাজত্ব কালে (১৩৫১-১৩৮৯ খ্রীঃ) পূর্বপাঞ্জাবে হিসার দুর্গ ও শহর নির্মিত হইয়াছিল। এই হিসার দুর্গে বি. ১৪৬৫ [১৪০৯ খ্রীঃ] বুধবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে লক্ষ্মীচন্দ্র কাব্যের অবচূরিকা নামক টীকা রচনা সমাপ্ত করিয়া ছিলেন।

লক্ষ্মীচন্দ্র ও তাঁহার উপদেষ্টা গাহড় ক্ষত্রিয়ের সময় উত্তর ভারতে কোনো বিজয়নগর ছিল না, দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন বিজয়নগর তখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। "রাসকের" কবি মুলতান ও কাম্বের মধ্যবর্তী বিজয়নগর নামক স্থান কোথায় পাইলেন? সুতরাং তাঁহারাই সর্বপ্রথম গবেষণা করিয়া বিজয়নগরকে বিক্রমপুর করিয়াছিলেন। এই বিক্রমপুর কোথায় লক্ষ্মীচন্দ্র স্পষ্ট বলেন নাই। আর একদফা অত্যন্ত আধুনিক হিন্দীগবেষণায় এই বিক্রমপুর জয়সলমীর রাজ্যের অন্তর্গত বিকুঁমপুর হইয়া গিয়াছে।

সন্দেশরাসকের আবিষ্কর্তা এবং ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সম্পাদক মুনি জিনবিজয় সূরি লক্ষ্মীচন্দ্রের টীকা "বিক্রমপুরাং" এর উপর তস্য টীকা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই "বিক্রমপুর" জয়সলমীরের অন্তর্গত। দ্বিতীয় সংস্করণের যুগ্ম সম্পাদকও উহাই মানিয়া লইয়াছেন। এই কাব্যের রচনা কাল মুনিজী সিহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্বে অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমান সমর্থন করিবার পূর্বে ত্রিপাঠীজী জয়সলমীরের হিন্দী ইতিবৃত্তের পাতা উল্‌টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জয়সলমীরের অন্তর্গত বিক্রমপুর বা বিকুঁমপুর বনজঙ্গলের মধ্যে এক পরিত্যক্ত স্থান ছিল। আমীর তৈমুর তোগলক্ সাম্রাজ্যের ছায়ালোপ করিবার পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাও কেলন (বিকুঁমপুরের কেল্‌না ভাটি শাখার আদি পুরুষ)[৪] এই বিকুঁমপুর পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সুতরাং

---

৪ বিকুঁমপুরের দূরত্ব জয়সলমীর শহর হইতে ৭০ ক্রোশ উত্তর দিকে; বিকানীর হইতে ৪০ ক্রোশ পশ্চিমোত্তর এবং মারবাড় রাজ্যের ফলোধি পরগণা হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে। মুলতান হইতে বর্তমান বাহবলপুর রাজ্যের অন্তর্গত দেরাবল নামক স্থানের [বিকুঁপুর হইতে ৬০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে] উপর দিয়া বিকানীর ও জয়সলমীর রাজ্যের সহিত বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে বিকুঁমপুর অবস্থিত। [দ্রঃ নৈনসী খ্যাত, দ্বিতীয়ভাগ পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫]

দেখা যাইতেছে, বিকুঁপুর টীকাকার লক্ষ্মীচন্দ্রের সময়ে ( ১৪০৯ ইং ) সম্ভবতঃ সমৃদ্ধ ও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্মীচন্দ্রের "গাহড় ক্ষত্রিয়" কবি অদ্দহমাণের বিজয়নগরকে বিক্রমপুর করিয়া গোলে-হরি-বোল দিয়াছেন, যেহেতু উত্তর-ভারতে কাম্বে ও মুলতানের মধ্যে বিজয়নগর নামে কোনো শহর কোনো কালে ছিল না। আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলী হয়তো কোনো মানচিত্রে মুলতান হইতে কাম্বে পর্যন্ত সোজা লাইন টানিয়া দেখিয়াছেন উহা জয়সলমীর রাজ্যের উপর দিয়াই যায়, এবং এই জন্যেই বিক্রমপুর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, উহা আকাশমার্গ; মুলতান হইতে কাম্বে যাইবার হাঁটা পথ আদৌ কোনো কালে জয়সলমীর রাজ্যের ভিতর দিয়া ছিল না।[৫] সেকালে সার্থবাহগণ বিকুঁমপুর পৌছিয়া কোনো দল বিকানীর-নাগোরের দিকে, কোনো দল জয়সলমীর হইয়া মারবাড় রাজ্যে যাইত। ফিরিবার পথে বণিক্ ও যাত্রীগণ অমরকোট [ জয়সলমীর হইতে ৯০ ক্রোশ পশ্চিমে ] ও সিন্ধুদেশের ভিতর দিয়া মুলতানে ফিরিত। মুলতান হইতে কাম্বে যাওয়ার প্রধান পথ— মুলতান— রোহরী [ সিন্ধুপ্রদেশ ] অমরকোট— বড় রুণ ( Greater Runn of Kutch ) পার হইয়া রাধানপুর— রাধানপুর হইতে ছোট রুণ পার হইয়া সৌরাষ্ট্রগুজরাটের ঢোল্কা— দক্ষিণ দিকে কাম্বে উপসাগরের তীরে কাম্বে বন্দর।

১. মুলতান— বাহবলপুরের মরুভূমি—ভাট্নের—হিসার—দিল্লী।

২. মুলতান—দেরাবল—বিকুঁমপুর—জয়সলমীর।

৩. মুলতান—উছ শহর—রোহ্রী ( সিন্ধু প্রদেশ )—অমরকোট—রাধানপুর—ঢোল্কা—কাম্বে।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্য সমালোচকগণ কবি-কল্পিত বিজয়নগরকে জয়সলমীরের বিক্রমপুর ভ্রম করিয়া কবির প্রতি অবিচার করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা-সরস্বতীকে উট-পাখির উপর বসাইয়াছেন। নায়িকার বিলাপে ও ষড়ঋতুবর্ণনায় রাসকের কবি যে সুজলা সুফলা প্রকৃতির ছবি আঁকিয়াছেন উহা পূর্ববঙ্গ কিংবা লাট-গুর্জর ভূমির বর্ষণ-মুখরা হাস্যময়ী প্রকৃতির ছবি হইতে পারে; রাজপুত মরুস্থলীর উদাসিনী প্রকৃতির করুণাবিমুখ কঠোরতার লেশও উহাতে নাই। রাসক-কাব্যে বিজয়নগরের যে সমাজচিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে উহা মারোয়াড়ী কিংবা বাঙ্গালী সমাজ নহে। ঐ সমাজ সুবিলাসী ঐশ্বর্যশালী গুজরাটী সমাজ; যে সমাজের লাট-নারী বাৎস্যায়নের কাল হইতে রতোৎসবে নৃত্যপরায়ণা ছিল, এবং এই যুগেও যেখানে নিত্য রাস ও গর্বা নাচ লোকজীবনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে রাসকের নায়িকার দেশে বালু নাই, উট নাই, অন্নজলের দুর্ভিক্ষ নাই, ছাগল ভেড়ার পাল নাই; স্ত্রীলোকের পরণে ও গায়ে মোটা কম্বল নাই, মাথায় জলের কলসী ও হাতে হালকা কুড়াল নাই। এ হেন দেশ কেমন করিয়া ধূ ধূ মরুর বুকে রাসক-কাব্যের বিক্রমপুর হইতে পারে? ইহার পরেও যদি কেহ কুতূহলী হইয়া "বিজয়নগর" কোথায় জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আমরা বলিব যেখানে নির্বাসিত যক্ষের অলকাপুরী সেইখানে—ভারতবর্ষের মানচিত্রে নহে।

কাব্য-নাটকে কিংবা লোকগীতি-প্রেমগাথায় ব্যক্তিসত্তা, স্থান ও কালের অনুসন্ধান রামের হেম-মৃগ অন্বেষণ, ইহাতে ব্যাপৃত হইলে "ধীয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি"। সুতরাং মুনিজী-র মতিভ্রম এই ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নহে।

---

৫ মধ্যযুগে মুলতান হইতে পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ দিকের প্রধান বাণিজ্যপথ।

মহাকবি গ্যেটে

আনুমানিক আটত্রিশ বৎসর বয়সে

# কাব্য ও জীবনজিজ্ঞাসা : গ্যেটে

শ্রীদেবব্রত সিংহ

### ভূমিকা

কাব্য ও জীবন, সাহিত্যসাধনা ও জীবনানুশীলন—এ দুয়ের অন্তরঙ্গ সন্নিকর্ষ প্রতিভার লক্ষণ হিসাবেই স্বীকৃত হত যে যুগে, সে যুগ প্রায় অতিক্রান্ত। তাই 'কাব্য জীবন-প্রত্যক্ষের বোধগোচর সারমর্ম' [১]— এমন সংজ্ঞানির্দেশ আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসায় কতটা গৃহীত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তবে যাঁর এই উক্তি, জর্মানীর কবিপ্রতিভার সেই শ্রেষ্ঠ পুরোধা গ্যেটের আপন কাব্যসাধনা ও প্রতিভার মর্মানুশীলনে উক্তিটি যে একটি সূত্রস্বরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গ্যেটের কাব্যের তথা সাহিত্যসাধনার ক্রমঃ-পরিণতিতে ও বিপুল ব্যাপ্তিতে আন্তর জীবনের পদক্ষেপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভূয়োদর্শন আর জীবনচর্যা এসে সমাহৃত হয়েছে নিবিড় জীবনবোধে, এবং তার সাথে অঙ্গীকরণ ঘটেছে সুপরিণত বিশ্ববীক্ষণের— অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যুগমানসের সার্থকতম অভিব্যক্তি, জর্মানীর কবিশ্রেষ্ঠ য়োহান্ হ্বোল্‌ফ্‌গাং গ্যেটের ( ১৭৪৯-১৮৩২ ) মধ্যে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ঐতিহ্যগত 'সার্বিক প্রতিভা'র ( universal genius ) অন্তিম প্রতিভূ গ্যেটে। পরিপূর্ণ জীবননিষ্ঠা, জীবনের সর্বাঙ্গীণ অনুশীলন, বহুবিচিত্রের রসাস্বাদন, অথচ সার্বজনীনতার মধ্যে বিচিত্রের অনুসরণের মধ্যে ঐক্যের সুর—উক্ত সার্বিক মানসের এই লক্ষণ। এই সার্বিকতার দাবী গ্যেটে-প্রতিভায় পুরোমাত্রায় রয়েছে। তাঁর আত্মপ্রকাশের ধারা বিচিত্রগ্রামী হয়েছে, বহুমুখী পরিচয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ ও মহীয়ান্ হয়েছে। তিনি কবি, 'ফাউস্ট' মহাকাব্যের রচয়িতা আবার তদানীন্তন অভিজাত শাসনতন্ত্রে হ্বাইমারের রাজসভায় তাঁর প্রতিষ্ঠা। তিনি রাজনীতিবিদ্ ও শাসন-পরিচালক ; তিনি বিদগ্ধ, তিনি আবার বৈজ্ঞানিক। জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞতার ধারার সূত্রপাত হল ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে গ্যেটের উত্তরযুগেই। গ্যেটের আপন কালেও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভাগ ও আবিষ্কার এতটা বিস্তার লাভ করে নি যে, বিজ্ঞান ও কাব্যের ব্যবধান অনিবার্য ও দুর্লভ বলে স্বীকৃত হবে।

প্রাণশক্তির ও মানসিক সজীবতার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি যে মানুষের মধ্যে ঘটেছিল, তাঁরই মধ্যে মিলেছিল অনন্য কবিপ্রতিভা যুগাবগাহী মননশীলতা, রাজনীতিজ্ঞের বিচক্ষণতা এবং বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা। আধুনিক ইংরাজ কবি স্টীফেন স্পেণ্ডার যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "Rather than the last Renaissance genius, one might say that Goethe was the first, and also the last, complete modern individual"। বিশেষত বিজ্ঞানোচিত বস্তুনিষ্ঠ প্রত্যক্ষানুসারী মন এবং কল্পনাশ্রয়ী স্বজ্ঞানিষ্ঠ অধিরোহী মন— এ দুয়ের এমন সার্থক সহ-অবস্থান গ্যেটের পূর্বে এবং পরে কোনো কবি মনীষীর মধ্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

প্রশ্ন উঠতে পারে : গ্যেটের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে উল্লিখিত রেনেসঁসধর্মী সনাতনী সুস্থিতি কি জন্মসিদ্ধ ?

---

১ "Dichtung ist siunliches Resumée der Lebenserfahrung"—গ্যেটে-সংলাপের রীমার (Riemer)-কৃত উদ্‌ধৃতি।

না তাঁর জীবনবোধেরও ইতিহাস রয়েছে— জীবনের বহুবিচিত্র উপাদানের সংঘাতে জীবনদর্শনের ক্রমবিকাশ রয়েছে? সিদ্ধ পুরুষের দৈবানুপ্রেরিত উপলব্ধি বলে যদি এক কথায় গ্যেটে-প্রতিভাকে— তথা যে-কোনো প্রতিভাধর পুরুষকে— মেনে নেওয়া না হয়, তবে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-পরিচয়ের ধারাকে অনুসরণ করে গ্যেটের জীবনবেদের পর্যালোচনা করাই সংগত। কারণ সব সার্বিক প্রতিভার ক্ষেত্রেই যেমন, তেমনি গ্যেটের ক্ষেত্রেও তাঁর সর্বানুগ্রাহী পরিপূর্তি সাধন করতে সমগ্র জীবনকালের বিস্তারের অপেক্ষা করেছিল। আর গ্যেটের জীবনের ব্যাপ্তি ছিল সুদীর্ঘ আট দশক ধরে। এই প্রসঙ্গে গ্যেটের পরম অনুধ্যায়ী এ যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যের সম্ভবত শেষতম অনুসারী টমাস মান-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য : [২] 'গ্যেটের অনেক সময়ের প্রয়োজন হ'তো সব কিছুর জন্য। তাঁর জীবনটাই ছিল স্থায়িত্বের পটভূমিকায় পাতা।' গ্যেটের স্বভাবগত কাল-তিতিক্ষাকে এমন কি আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা বলেও মনে করা হয়েছে। আমাদের এযুগের স্বভাবসুলভ ক্ষিপ্রতা ও ব্যস্ততার সাথে এই ধ্রুব মন্থর জীবনানুশীলনের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। তবু জীবনশিল্পী গ্যেটের সংক্ষুব্ধ চেতনাতেই আবার প্রকট হয়েছে এই দুরন্ত সত্য ('ফাউস্টে' হ্বাগ্‌নারের মুখে): শিল্প সুদূরপ্রসারী আর সংক্ষিপ্ত আমাদের জীবন। ("Die Kunst ist laug, und kurz ist unser Leben")।

নিজের সমগ্র শিল্পকে ও সৃষ্টিকে গ্যেটে এক সুদীর্ঘ আত্মচরিত বলে অভিহিত করেছেন। নিজের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ঋতুপরিবর্তনে মূর্ত হয়ে উঠেছে আন্তর জীবনে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। প্রথম সৃজনী পর্যায়ের যে স্বতঃস্ফূর্ত দুর্বার আত্মপ্রকাশ তা ক্রমে অপসৃত হল জীবন-পরিক্রমার সাথে সাথে, এবং পরিণতিলাভ করল নিবিড়তর চেতনা ও আত্মসংহতিতে। গ্যেটের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা "তরুণ হ্বার্থারের দুঃখ" (Die Leiden des jungen Werthers) এবং আদি যৌবনের কবিতা ব্যক্তিগত সংক্ষোভ ও রোমান্টিক জীবনদৃষ্টিরই অভিব্যক্তি ছিল। এই নবীন জীবন ক্রমে ক্রমে সংহত হল পরিপক্ব সুস্থিত জীবনবোধে। তাই গ্যেটের চল্লিশোত্তর জীবনে ক্রমশ যেন জীবনই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। স্পেণ্ডার এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "At first his life wrote his poetry; after, his greatness wrote his life।"[৩]

গ্যেটে-প্রতিভায় কাব্য ও জীবনের এই পরস্পর-প্রতিফলনের ধারাকে অনুশীলনের প্রয়াসে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর জীবনদর্শনের অভিব্যক্তির ক্রমন্বয়ী সূত্রকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। সে সূত্রের অনুসন্ধান মিলতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনজিজ্ঞাসার আধার বিশিষ্ট-লক্ষণ-ধর্মী কয়েকটি কবিতায়। আপন বিশ্ববীক্ষণের (Weltanschauung) কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানে গ্যেটের অনুভূতিনিষ্ঠ কবিমানস স্বভাবতই প্রবৃত্ত হয় নি, কিন্তু তাঁর সৃজনী সাহিত্য থেকে সে বীক্ষণ উদ্ধার করা কিছু দুঃসাধ্য নয়।

**আদি পর্ব**

স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তির ও আবেগপ্রবণতার চূড়ান্ত রূপ যেন তরুণ গ্যেটের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। কবির এই নবীন মূর্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্যেটের উত্তরসূরী জর্মান কাব্যের রোমান্টিক ধারার চূড়ান্ত প্রতিভূ হাইনে

২ দ্রষ্টব্য: Thomas Mann, Leiden and Grösse der Meister ("Essays of three Decades"). Stephen Spender, Introduction, "Great Writing of Goethe".

বলেছেন : "all strength and energy from crown to toe ; a heart filled with emotion, a fiery spirit, soaring with the wings of an eagle।" তাঁর এই সময়ের সাহিত্যসৃষ্টিতে দেখি প্রাণধর্মের অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি ও অকৃত্রিম আবেগময়তা। অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রথম স্ফুরণে নিজের মধ্যে অনন্ত ক্ষমতার নেশায় যেন উন্মত্ত এই তরুণ।

প্রথম যৌবনের দুরন্ত স্পর্ধা ও আবেগ স্বকীয় লক্ষণে প্রকাশ পেয়েছে গ্যেটে-প্রতিভার বিকাশের আদিপর্বে একটি বিশিষ্ট কবিতায়। মানুষের সমস্ত বৃত্তির পরিস্ফুরণের যে সুবর্ণ অধ্যায়, যখন মনের দুর্বার ক্ষুধা, অন্তরের অনন্ত তৃষ্ণা পৃথিবীকে জীবনকে জানবার জন্য, ভোগ করবার জন্য, আত্মসাৎ করবার জন্য দুনিয়ার বিচিত্র রসভাণ্ডার— তারই প্রমত্ত আবেগ মূর্ত হয়েছে এই অপূর্ব বলিষ্ঠ কবিতাটিতে। কবিতাটির নাম "প্রমীথিয়ুস" ( Prometheus )—প্রসঙ্গ বলা বাহুল্য ক্লাসিক্যাল। গ্রীক পুরাণের প্রমীথিয়ুস মানুষের কল্যাণের উদ্দেশে স্বর্গ থেকে দেবতাদের অগ্নি আহরণ করে এনেছিলেন পৃথিবীতে, আর হয়েছিলেন দেবতাদের অপরিসীম রোষের পাত্র। এই কবিতার প্রসঙ্গে গ্যেটে আত্মজীবনীতে বলেছেন : 'প্রমীথিয়ুসের কাহিনী আমার মনে আবার জীবন পরিগ্রহ করল।'

প্রমীথিয়ুস অতিপার্থিব দেবত্বের বিরুদ্ধে মানবতার চিরবিদ্রোহের জ্বলন্ত বিগ্রহ। যে বিদ্রোহী যৌবনের আবেগকে লক্ষ্য করে বলতে হয়, 'এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে', তারই এক বলিষ্ঠ চিত্র রূপায়িত করেছেন গ্যেটে প্রমীথিয়ুসের রূপককে সম্মুখে রেখে। গ্রীক দেবরাজ জীয়ুসকে ( Zeus ) উদ্দেশ করে কবি শুরু করছেন :

আবৃত কর তোমার আকাশ
মেঘের বাষ্প দিয়ে ;
শিশুর হাতে ছিন্ন যেমন ঘাস—
কৌশলে তব কাঁপে
ওকের শীর্ষ গিরির শৃঙ্গ আর।

কিন্তু যৌবনের মেজাজ উদ্ধত, দৈব শাসনের তথা দৈব অনুগ্রহের তীব্র বিরোধিতায় মুখর। আপন শক্তির উপর অকুণ্ঠ তার বিশ্বাস, কোনো অলৌকিক শক্তির নির্দেশ সে মানতে নারাজ। স্পর্ধিত আহ্বানে কবি তাই ইঙ্গিত করছেন মাটির পৃথিবীর দিকে— যে পৃথিবী মানুষের ভোগ্যা, যাকে সে রচনা করে নিয়েছে আপন খুশিতে, আপন ইচ্ছায় ও প্রয়োজনে।

ধরিত্রী সে তো আমারই লাগি,
গেহ আমার রয়েছে সে তো জানি—
রচেছ কি তুমি তারে ?
আছে আমার ঘরের আগুনখানি,
সে শিখা তব ঈর্ষা জাগায় আমার পরে।

দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধিত যৌবনের বিদ্রূপে কবি মুখর ; বলছেন : এ বিশ্বে দেবরাজের চেয়ে দীন আর কে আছে ? যত শিশু আর যত ভিখারীর দল মিলে প্রার্থনা আর মিনতির মধ্য দিয়ে দেবতাকে জিইয়ে

রাখে—তাদের নিবুদ্ধিতার তুলনা নেই। নিজের শৈশবকে মনে করে কবি বলছেন, পৃথিবী সম্বন্ধে বোধ যখন স্পষ্ট হয় নি, তখন তিনি অসহায়ের মতো দেবতার করুণা ভিক্ষা করতেন। আজ যখন আত্মপরিচয় ঘটেছে, তখন কবি বুঝতে পারছেন, দেবতা তো তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে দাসত্বের কবল থেকে বাঁচান নি। "হে মোর জলন্ত হৃদয়, তুমি নিজেই কি সব সাধন কর নি? আর অজ্ঞতার বশে আত্মপ্রবঞ্চনা কর নি কি সেই দেবতার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে?" কেন তোমায় শ্রদ্ধার্ঘ জানাই—এই জিজ্ঞাসায় কবির অন্তর বিক্ষুব্ধ, অসহিষ্ণু হয়েছে তাঁর মন অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রশ্ন তাই দেবতার কাছে! 'তুমি কি ব্যথিতের বেদনা প্রশমিত করেছ? শান্ত করেছ কি ক্ষুব্ধের অশ্রু?'

কেবল বিদ্রোহী উন্মাদনাতেই কবির আত্মপ্রকাশ ক্ষান্ত হয় নি; প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপিত হয়েছে কবির মন। অবজ্ঞার ব্যঙ্গ নিয়ে দেবতাকে উদ্দেশ করছেন, 'তুমি কি মনে কর জীবনকে অস্বীকার করি আমি, পালিয়ে যাই মরুভূমিতে—সব স্বপ্ন সার্থক হয় না বলে?' কবি উপসংহারে এই দৃপ্ত আশা প্রচার করছেন যে তিনি পৃথিবীতে থেকে গড়তে বসেছেন সেই অনাগত মানবসমাজকে, যারা তাঁরই মতো 'কষ্ট পাবে, কাঁদবে, ভোগ করবে, হাসবে, অথচ দৃকপাত করবে না সেই স্বর্গবাসী দেবতার দিকে।'

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রকাশিত (১৭৭৪) এই কবিতাটি সৃজনোন্মুখ মনের স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা ও অপরিমিত আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষর বহন করে। এই প্রসঙ্গে গ্যেটে তাঁর আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছেন: মানুষের অদৃষ্ট তাদেরই পক্ষে একান্ত বেদনাদায়ক হয় যাঁদের মানসিক ক্ষমতা অল্পবয়সে ও তাড়াতাড়ি বাড়ে। অন্যত্র গ্যেটে বলেছেন, প্রতি শিল্পীর মধ্যেই একটা ঔদ্ধত্যের সুর আছে, আর সেটা ছাড়া কোনো শিল্পী-প্রতিভাকে কল্পনা করা যায় না। গ্যেটের এই শিল্পীজনোচিত ঔদ্ধত্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে টমাস মান এই অভিমত পোষণ করেছেন যে এর উদ্ভব হয়েছে কামজীবনে ও বৌদ্ধিক জীবনে গ্যেটের বিশিষ্ট ভূমিকা থেকে। কারণ, এই দুই ব্যাপারেই গ্যেটের অনন্যসাধারণ তীব্রতা তাঁকে স্বভাবতই বিপ্লবী, এবং গতানুগতিকের অনুবর্তনের পরিপন্থী করে তুলেছিল। অবশ্য এই মনোভাবের অত্যধিক একমুখীনতায় একরকম অসুস্থতারই উপক্রম করেছিল; আর তার মূলে ছিল একদিকে যেমন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তরুণের অভিজ্ঞতার স্বল্পতা, অপরদিকে আত্মকেন্দ্রিক (তথা জগৎবিমুখ) ভাবসর্বস্বতা।

গ্যেটের প্রতিভা-বিকাশের আদিপর্বে এই বিদ্রোহী-চেতনার পিছনে রয়েছে একটি পুরোমাত্রায় রোমান্টিক মন ও জীবনগতি। যৌবনে গ্যেটে একটি অতি-রোমান্টিকতার অসুস্থ অবস্থা অতিক্রম করেছেন। এমন-কি তা তাঁকে নৈরাশ্য, আত্মহত্যা ও উন্মত্ততার উপান্তদেশে নিয়ে এসেছিল। হতাশার চূড়ান্ত অবসাদের মধ্য দিয়ে অনেক সময় এই কল্পনাবিষ্ট যুবকটিকে কাটাতে হয়েছে। এক দুরন্ত মৃত্যু-বিলাসিতায় তাঁর মন এসময়ে পীড়িত হয়েছিল। এইসব অভিজ্ঞতাই বোধ করি উত্তরকালে গ্যেটেকে এই সত্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, যা ক্লাসিক্যাল ত স্বাস্থ্যের, এবং যা রোমান্টিক তা অসুস্থতারই পরিচায়ক।[৪]

এই প্রসঙ্গে গ্যেটের ব্যক্তিজীবনের প্রণয়-ইতিহাস ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আদি পর্বের শ্রেষ্ঠ রচনা "তরুণ হ্বার্থারের দুঃখ" স্বভাবতই আলোচ্য। গ্যেটের প্রণয়প্রতিভা সুবিদিত। কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জীবনের নানা পর্যায়ে—বিশেষত যৌবনকালে—গ্যেটে বিভিন্ন নারীর প্রেমে সাড়া দিয়েছিলেন, আর

৪ দ্রষ্টব্য: "The classical is health and the romantic disease"—Maxims and Reflections.

তা থেকে আনন্দবেদনার বিচিত্র রসে সিঞ্চিত করেছেন আপন সত্তাকে, উজ্জীবিত করেছেন আপন মানসলোক।[৫] গ্যেটে তাঁর আত্মজীবনী "Dichtung und Wahrheit" ( ***Poetry and Truth from my own life*** ) গ্রন্থে অপূর্ব বস্তুনিষ্ঠা সহকারে তাঁর জীবনের প্রথম ছাব্বিশ বছরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন— আর তাতে কিশোর বয়স থেকে তাঁর বিভিন্ন প্রেম-কাহিনীও বিবৃত আছে। নিজের জীবনকথার এত বিষয়ানুগ প্রদর্শন— যেন নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসেরই সমগোত্রীয়— এত সত্যনিষ্ঠা বোধ হয় কবিমহলে বিরল ; হয়তো ইউরোপীয় মনীষী বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বার্ধক্যের প্রায় উপান্তদেশে এসে এই আত্মকাহিনীতে গ্যেটে যেন নিরপেক্ষ দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন— আর আপন প্রতিভার বিকাশের প্রথম পর্ব শিল্পীর গঠনোন্মুখ পর্যায়কে উপস্থিত করেছেন। জর্মানীর শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা নিজেকে জগতের কাছে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, আর তাই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর শিল্পীসত্তার সংগঠনে ক্রিয়মান বিচিত্র প্রভাবরাশির প্রতি। আত্মচরিতের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য সুস্পষ্ট : জীবনচরিতের প্রধান উদ্দেশ্য আমার মনে হয়, মানুষকে তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো, আর দেখানো কতটা এই পরিবেশ তাঁর পক্ষে প্রতিকূল বা অনুকূল হয়েছিল ; কি করে তিনি তা থেকে জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে একটা জীবনদর্শন গড়ে তুললেন এবং কি করেই বা তিনি শিল্পী কবি বা গ্রন্থকার হয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মূর্তভাবে উপস্থিত করলেন।

যাই হোক্, যে গ্রন্থটি তরুণ গ্যেটেকে প্রায় রাতারাতি তদানীন্তন জর্মান সাহিত্যের পুরোভাগে নিয়ে এল, তার মৌলিক রচনাশৈলী ও আবেগ-মুখরতার জন্য, তা হল "তরুণ হ্বার্থারের দুঃখ" ( ডি লাইডেন ডেস্ ইয়ুংগেন হ্বার্থার্স্ )। আর ব্যক্তিগত জীবনে তার পটভূমিকা রচিত হয়েছিল এই পর্যায়ে গ্যেটের জীবনে একটি অন্তরঙ্গ প্রণয়ব্যাপারে। সাধারণ এক ধর্মযাজকের কিশোরী কন্যা ফ্রেডারিকার সাথে মধুর প্রেমের অধ্যায়টি তরুণ গ্যেটে যখন উত্তীর্ণ হতে চলেছেন, আনন্দবিহ্বল সাহচর্যের পর বিচ্ছেদের বেদনা যখন ঘনায়মান, সেই আলো-আঁধারি চিত্তসংক্ষোভের মধ্যে এই রচনাসৃষ্টির পরিকল্পনা গ্যেটের মনে উদয় হয়। তা ছাড়া এ সময়ে গ্যেটে পূর্বসূরীদের সৌন্দর্যচিন্তার সাথে পরিচয় লাভ করতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন যে তাঁদের অনুভূতির পটভূমিকার সাথে নিজের উপলব্ধিকে মেলাতে পারছেন না। তখনই গ্যেটের মধ্যে সেই অকৃত্রিম অভীপ্সা জাগলো আপন বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতিকে অন্বীক্ষণ করবার, আর গভীর বিস্ময়ে সেই পরিচয়ের সম্মুখে মনকে মেলে ধরবার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, তৎকালীন জর্মান সাহিত্যে যে প্রেরণাপ্রধান 'ঝড়ঝাপটা' আন্দোলনের ( Storm and Stress ) পুরোধা ছিলেন তরুণ গ্যেটে, তারই পরাকাষ্ঠা হ্বার্থার রচনায় ( ১৭৭৪ )। এই ঝড়ঝাপটা-যুগের মূলতত্ত্ব ছিল—জন্মগত ঐশীপ্রতিভা কোনো প্রচলিত রীতি বা শৈলী অনুসরণ করে না, নূতন নীতি বা শৈলী তৈরি করে নেয়।

হ্বার্থার-রচনার পটভূমিকার কথা উল্লেখ করে গ্যেটে তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন : তিনি চাইলেন তাঁর আন্তর জীবনকে সব রকম বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। আপনার পরিবেশী সবাইকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে, এবং মানুষ থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণী পর্যন্ত প্রত্যেক জীবের প্রভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করতে।

---

৫ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের সতেরো বছর বয়সে লেখা একটি প্রবন্ধ, "গ্যেটে ও তাঁর প্রণয়িনীগণ"— বাংলা ১২৮৫ সালে কার্তিক সংখ্যায় "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত— যা থেকে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বিকাশমান কবিমানসের উপর জর্মান কবির প্রভাব অনুমান করা অসংগত হবে না।

এইভাবে প্রকৃতির সাথে বিশ্বচরাচরের সাথে যেন এক স্বরে বাঁধা হল তাঁর অন্তরের তন্ত্রী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'— এই অনুভূতিতে অবগাহন যতটা সহজসিদ্ধ হতে পেরেছিল, হয়তো আরও ইহনিষ্ঠ ইউরোপীয় কবির পক্ষে তা নিতান্ত সহজ হয় নি। নিবিড় মানবিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিবেশে সংবেদনশীল মনে শূন্যতা এসে জমেছিল, অবসাদের মালিন্য ছিল। গ্যেটে আত্মকাহিনীতে সে কথার আভাস দিয়েছেন স্পষ্টই। তবু জীবনকুঞ্জের যে মধুররসে আপন চিত্তকে সঞ্জীবিত করতে পেরেছিলেন, তারই উদ্দীপনা অন্তরকে জুড়ে ছিল। সাময়িক অবসাদ তাই তাঁর সৃজনী আত্মপ্রকাশকে ব্যাহত করতে পারে নি। আত্মগ্লানি ও বৈনাশিকতার মোহ থেকে নিজেকে সবলে মুক্ত করলেন গ্যেটে, তাঁর এই প্রথম উপন্যাস রচনা করে— আর সেটা হল মৌলিক এক বিয়োগান্তক রচনা!

সমসাময়িক এক মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে গ্যেটেকে এই রচনায় প্রেরণা ও উপাদান যুগিয়েছিল সন্দেহ নেই। সে সময়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে—গ্যেটে যে শহরে আজন্ম বাস করছিলেন— এক প্রতিষ্ঠাবান্ যুবক আত্মহত্যা করেছিল বন্ধুপত্নীর প্রতি অনুরাগের ফলে। হ্বার্থারের অদৃষ্ট নিয়ে গ্যেটের যে কল্পনা ইতিপূর্বেই ক্রীড়া করছিল, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা রূপ পরিগ্রহ করল নাতিদীর্ঘ সেই প্রেমের ট্র্যাজেডির মধ্যে। কেবল রোমাঞ্চপ্রীতি নয়, সংবেদনশীলতাই হ্বার্থার গ্রন্থের মূলসূত্র, এবং এই অনুভূতির তন্ময়তা বিরহের সুরে গাঁথা। গ্যেটের নায়ক একান্তই রোমাণ্টিকস্বভাব; যে সুখের অঙ্গুলিসংকেতে প্রতিনিয়ত সে অস্থির হচ্ছে সে সুখ তার নাগালের বাইরে। সংসারের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ এই যে, সংসার তাকে ভুল বোঝে। 'আমাদের মতো মানুষের ভাগ্যই এমন যে লোকে আমাদের ভুল বোঝে'— এই আত্মপীড়ণের বিলাসে অহংকেন্দ্রিক হ্বার্থার নিমজ্জমান।

এই রচনা গ্যেটের আন্তর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ে পদক্ষেপের সূচনা করল। আত্মকাহিনীতে এই প্রসঙ্গে গ্যেটে লিখেছেন: 'আমি অনুভব করলাম যেন সাধারণভাবে আমি এক স্বীকারোক্তি করেছি, আর তার ফলে আবার যেন মুক্তি ও আনন্দ পেয়েছি, এবং এইভাবে নূতন জীবন সুরু করবার যোগ্যতা লাভ করেছি।' ("I felt as if I had made a general confession, and was once more free and happy, and justified in beginning a new life")[৬] বস্তুত গ্যেটের আপন বিচারে তাঁর সব-কটি সার্থক সৃষ্টিই—হ্বার্থার, টাসো, ফাউস্ট, হ্বিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টার ইত্যাদি—এক মহৎ স্বীকারোক্তিরই যেন অঙ্গীভূত। অবশ্য হ্বার্থারের প্রকাশের পর গ্যেটের দেশে—এমন-কি ইউরোপের অন্যত্রও, বিশেষত ফ্রান্সে—কিছুদিন ধরে বুদ্ধিবাদী মহলে হ্বার্থার-সুলভ 'বিশ্ববেদনা' (Weltschmerz) প্রায় একটা ঢঙে পরিণত হল— এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর, তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার যেন এক হিড়িক পড়ে গেল। সে সময়ে জনপ্রিয়তার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তরুণ লেখক উপভোগ করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্যেটের স্বভাবমূলে তার প্রতি আকর্ষণ কমই ছিল। পপুলার প্রতিধ্বনির কথা বাদ দিলেও এই শক্তিশালী স্বকীয়তাব্যঞ্জক রচনাটির উৎকর্ষ নিয়ে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে বাদানুবাদ যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু গ্যেটে নিজেই বলেছেন, সে সব জল্পনা তাঁর সৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য ধরতে পারে নি। সে তাৎপর্য তাঁর আনন্দ-

---

৬ Poetry and Truth from my own Life, Vol. II, (trans. by Minna S. Smith).

বেদনাময় জীবনরসেই নিহিত আছে। হ্বার্থারের স্রষ্টা সেই যুবক লোকসমাজের কোলাহলের অন্তরালে আত্মপরিপূর্তির ধাপে ধাপে নীরবে অগ্রসর হয়েছেন। গ্যেটের নিজেরই কথায়— 'প্রতিভা পুষ্ট হয় নির্জনতায়, চরিত্র তৈরি হয় জনসংঘাতে।'

মধ্যপর্ব

হ্বার্থারের বিশ্বলীন আবেগময়তায় ও প্রমীথিয়ুসের বিদ্রোহী উদ্দীপনায় যে মনের অভিব্যক্তি ঘটেছিল, তার ভাবান্তর লক্ষ্য করি মানস বিবর্তনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে— পরিণত যৌবনের পর্যায়ে। পূর্বোক্ত 'ঝড়ঝাপটার যুগ' গ্যেটের জীবনে মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। পরিপক্ব জীবনজিজ্ঞাসার পথে এই পাঁচ বছরে কবি একটা ফলপ্রসূ পর্ব অতিক্রম করেছিলেন আত্মিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্তি এবং আবেগে ও অতিরাগে আত্মসমর্পণ— ঝড়ঝাপটাযুগের এই মূলমন্ত্র মানবিক নিয়তির প্রশ্নে কবিচেতনায় কোনো তৃপ্তিদায়ক সমাধান উপস্থিত করতে পারে নি। ফলে আত্মিক নিঃস্বতার বোধই কবির মধ্যে প্রকট হয়েছিল। জীবনজিজ্ঞাসার এই সংকট উত্তীর্ণ হয়ে কবির মানস স্থৈর্যকে পুনরুদ্ধার করবার অবকাশ এল হ্বাইমারের কাজে নিযুক্তির সাথে। বিশ্ববীক্ষণের পরিণতির পথে মধ্যপর্বে এই পদক্ষেপ। অশান্ত প্রমীথিয়ুস ক্রমে আত্মচেতনায় অবগাহী হলেন, ফলে অন্তর্মুখী কবিচেতনা সসীমতার বোধে সংযত হল। মানুষের শক্তি একান্ত সীমিত এই বোধ কবির বিক্ষুব্ধ অন্তরে সমতা আনবার উপক্রম করল। বিশ্বনিয়ন্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মূঢ়তা উপলব্ধি করলেন কবি, ক্রমে দেখা দিল একটা গ্রহণশীলতার ভাব উত্তরযৌবনের সনাতনী জীবনবেদে।

জীবনজিজ্ঞাসার এই নবরূপায়ণের লক্ষণ বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে রচিত একটি কবিতায় (১৭৮১)— "মানবতার সীমা" (Grenzen der Menschheit)। মানবপ্রকৃতির একান্ত সসীমতার কথাই প্রচার করেছেন কবি এই কবিতাটিতে। "যখন সুপ্রাচীন দেবরাজ জীয়ুস মৃদু হস্তে ঘূর্ণমান মেঘরাশি থেকে বিদ্যুতের আশিষখানি পাঠান, চুম্বন করি আমি তাঁর বসনের শেষপ্রান্তটুকু, আর জাগে আমার অনুগত হৃদয়ে নবীন কম্পন।" 'প্রমীথিয়ুস'এর মতো এ কবিতার সূত্রও ক্লাসিক্যাল সন্দেহ নেই; কিন্তু পূর্ব কবিতার সুর এখানে যেন রূপান্তরিত, প্রায় অন্তর্হিত। এ কবিতায় দেবতার মাহাত্ম্যই কবি গেয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে, সানন্দে। স্বীকার করতে তাঁর কোনো আক্ষেপ বা দ্বিধা নেই যে 'দেবতার সাথে পরিমাপ হয় না কোনো মানুষের'। বিশ্বব্যাপ্ত প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মকে স্বীকার করাতেই প্রজ্ঞার পরিচয়। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় এই অপার বিশ্বরহস্যের কতটুকু ধরতে পারে। বিপুলা বিশ্বশক্তিকে যুঝবার সংকল্প তো নিতান্তই শিশুর উন্মত্ততা ছাড়া কিছু নয়! কবির কথায়, এই বিশ্বসৃষ্টির অনাদি প্রবাহের তরঙ্গপাতে আমরা উঠছি পড়ছি; সামান্য অক্ষম জীব আমরা এই বিরাট বিশ্বের পটভূমিকায়। আমাদের গোটা জীবন যেন এক সীমার বাঁধনে ঘেরা; সে বাঁধনের ওপারে আছে সৃষ্টির অনন্ত ক্ষেত্র। আর এই গণ্ডী কেবল ব্যক্তির সত্তায় নয়, সমষ্টিজীবনেও এই একই বাঁধন।

কবিতাটিতে একটি ভাব স্ফুটমান হয়েছে, যাকে এক কথায় বোধ হয় বলা যায় 'নিয়তিবাদ'— বা ব্যাপকতরভাবে অভিহিত করা যায় নির্দেশ্যবাদ। অবশ্য এ নিয়তিবাদ মানবজীবনের অদৃশ্য পরিচালক 'দৈবে'র উপর অন্ধ বিশ্বাসের সগোত্র নয়। এ বিশ্বাস আরও উন্মুক্ত আরও প্রশস্ত। মানুষ শুদ্ধ সমস্ত

বিশ্বসৃষ্টিই এক দুর্নিবার নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলিতে মানবজীবনের যে ট্র্যাজেডি আঁকা হত, তার পিছনে আগাগোড়া স্বীকৃতি পেত দৈবের ( Fates ) খেলা। গ্যেটের ক্লাসিক অভিমুখী মন এই ধ্রুবা দৃষ্টিকে স্বীকার করল বটে, কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি 'দৈব'তে এসে থেমে গেল না। তা বিশ্বসৃষ্টির মূলতত্ত্বের অন্বীক্ষণে তৎপর, আর সেই তত্ত্বের সাথে মানবসত্তার যোগসূত্রসাধনে প্রয়াসী। তরুণ কবির প্রকৃতি-বীক্ষণে অতিপ্রাকৃতের যে স্বীকৃতি জড়িয়ে ছিল, কবিমানসে তা দুরূহ প্রশ্নের সূচনা করেছিল। যা প্রকৃতিতে বিরোধের মধ্যে ব্যক্ত, এবং একটি প্রত্যয়ের দ্বারা যার নির্বচন সম্ভব নয়, সে তত্ত্ব দেবসুলভ নয়, মানবসুলভও নয়, কিংবা দেবদূতসুলভও নয়; সে তত্ত্ব যেন নিয়তির সগোত্র। তাই ক্লাসিক্যাল সূত্র অনুসরণ করে গ্যেটে তাকে অভিহিত করতে চেয়েছেন 'দানব-তত্ত্ব' (Daemonic) ব'লে।

বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রণধারার অন্তপ্রবাহ এবং অনন্তের ব্যঞ্জনায় ব্যক্তিসত্তার তাৎপর্য নির্দেশ গ্যেটের এই বিশ্ববীক্ষায় যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক স্পিনোজার ( Spinoza ) সর্বব্রহ্মবাদী চিন্তাধারা ( pantheism )। বিশ্বব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক নির্ধারণতত্ত্বের অনুসারী ব্যক্তিজীবনে সম্বুদ্ধ ক্ষান্তি—সংক্ষেপে স্পিনোজার দর্শনের এই মূল কথা। জীবনচরিতে গ্যেটে উল্লেখ করেছেন, যৌবনে স্পিনোজার ভাবধারার সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে গভীর রেখাপাত হয়েছিল—উত্তরকালে যার প্রভাব রূপায়িত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিমানসে।[৭] সপ্তদশ শতাব্দীর এই অসাধারণ মনীষার সাথে প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গে গ্যেটে লিখেছেন, যে সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র তাঁর প্রকৃতিকে মার্জিত করবার উপায় জগতে অনুসন্ধান করে বিফল হয়ে তিনি অবশেষে এই দার্শনিকের "নীতিদর্শনে" ( Ethics ) প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নিছক তত্ত্বানুশীলনেই নয়, স্পিনোজা-দর্শনে গ্যেটে পেলেন তাঁর অভিব্যক্তির প্রশমন এবং প্রত্যক্ষ ও নৈতিক জগতের এক অপার মুক্তির আস্বাদন। যা তাঁকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল, তা হল স্পিনোজার বাণীর মর্মস্থলে নিরাসক্তির সুর। সব কিছুতে বিশেষত প্রেমে ও সখ্যে নিরাসক্তি অর্জন করাই ছিল গ্যেটের মহত্তম অভীপ্সা, তাঁর জীবনচর্যার আদর্শ সূত্র। এই দৃষ্টির পরিপূর্তি লক্ষ্য করা যায় গ্যেটের উত্তরজীবনে ( অন্তপর্ব দ্রষ্টব্য )— তাঁর মর্ম-উৎসারিত এই কথায়: 'তোমায় যদি বাসি ভালো, তোমার তাতে কি ?'

যাই হোক্, উল্লিখিত কবিতাটি সেই সীমাসচেতনতারই স্বাক্ষর বহন করছে, যার মাধ্যমে ঘটেছে রোমান্টিক কবির ঔদ্ধত্য-বিলাপ থেকে নির্মুক্তি এবং মহত্তর বিশ্ব-স্বীকৃতির বোধে উত্তরণ। কিন্তু গ্যেটের এই ভাবানুক্রমের পিছনে রয়েছে আবার জীবননাট্যের বিচিত্র দৃশ্যান্তর। কারণ গ্যেটের সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে গিয়ে এযুগের অপর গ্যেটে-অনুধ্যায়ী মনীষী সোয়াইৎসরের উক্তির যাথার্থ্যই প্রমাণিত হয় 'Everything that he offers is what he himself has experienced in thought and in events, material which he worked up into a higher reality. It is only through experience that we come nearer to him."[৮]

---

৭ জীবন-কথায় গোটে স্পিনোজার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন—তাঁর চিত্তে প্রশান্তি সঞ্চারের মূলে স্পিনোজার প্রভাব উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য Poetry and truth, Vol. II.

৮ Albert Schweitzer, *Goethe*.

গ্যেটের জীবনের তিনটি বিশিষ্ট ঘটনা তাঁর পরিণত পুরুষসত্তার রূপায়ণে যেমন তেমনি পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধের সম্প্রাপ্তিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত জর্মান রাজ্য হ্বাইমারের ডিউক কার্ল অগাস্টের রাজকার্যে সহায়তার জন্য ১৭৭৫ সালে ডিউকের আমন্ত্রণে মন্ত্রী হিসাবে যোগদান— গ্যেটের বয়স তখন ছাব্বিশ। এগারো বছর হ্বাইমারে বাস এবং শাসনকার্য থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্যন্ত বহুমুখী কার্যসূচীর ফলপ্রসূ অনুসরণ। দ্বিতীয়ত, এইখানে শার্লট ফন্ স্টাইনের সাথে তাঁর পরিচয় ও দীর্ঘ বারো বৎসরব্যাপী অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এগারো বছর হ্বাইমার-বাসের পর মন্ত্রীত্বের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ইতালী পরিভ্রমণ তৃতীয় ঘটনা। এই তিনটি ব্যাপারের সমবায়ে গ্যেটে-মানস ক্রমে ধ্রুপদী আদর্শের অনুরক্তিতে সুস্থিতিলাভ করল।

হ্বাইমারে ( Weimar ) মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে সেই ভাবোন্মত্ত যুবার রূপান্তর সুরু হল ; ঝড়ঝাপটার প্রবাহে সে আর নিজেকে ছেড়ে দিল না, ক্রমে সে হল তার আপন নিয়তির কারু— যে নিয়তি তার কাব্যকে মূর্তিদান করল। বলা যায়, ১৭৮৪ সাল থেকেই গ্যেটে এমন এক নূতন জীবনধারার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যার মধ্যে সমাবেশ ঘটবে সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ও সুসমতার। হ্বাইমার ও রোম তাঁর এই এষণার পরিণতি সাধন করল। হ্বাইমারের রাজসভায় অভিজাততান্ত্রিক পরিবেশে রাষ্ট্রিক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে গ্যেটে নিজের আত্মিক বেগকে নিয়মিত করতে চেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রোমান্টিকোত্তর কাব্যের সুনিশ্চিত ভূমিকা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন রোমে গিয়ে— ইউরোপীয় সনাতনী সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থানে। তাঁর ইতালী পর্যটনে গ্যেটের কবিচেতনায় প্রধানত পুরাকীর্তির মহিমাই উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবিচিত্তের সেই সশ্রদ্ধ পুলক গ্রথিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত "রোমক শোকগাথা"তে ( Roman Elegies )— "সনাতনী ভূমি এই, হেথা আমি পুলকিত পেয়েছি প্রেরণা।"

হ্বাইমারের রাজকার্য ও ইতালীয় ভ্রমণের অন্তর্বর্তী আর-একটি অন্তরঙ্গ ব্যাপার গ্যেটের মানবজীবনের উত্তরণে গভীর প্রভাব সঞ্চার করেছিল। পরিণত যৌবনের এই পর্বে গ্যেটের নিবিড় অনুরাগের পাত্র ছিলেন শার্লট— বয়সে সাত বছরের বড়ো, রাজসভার পদস্থ কর্মচারীর পত্নী, সাতটি সন্তানের জননী। তাঁর হ্বার্থার যেমনভাবে ভালোবেসেছিল লোটেকে ( Lotte ), তেমনি অতিরাগের সাথে গ্যেটে ভালোবেসেছিলেন শার্লটকে। কিন্তু সে ভালোবাসায় ছিল বিষণ্ণতা, ছিল একটা ক্ষীণ সংশয়— শার্লটের বিনম্র নির্দেশেও সে সংশয় অব্যাহত ছিল। অপরিপূর্তির দ্বিধায় এই প্রেমসম্পর্ক স্বভাবত ব্যাহত হলেও উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল সন্দেহ নেই— প্রায় প্লেটোনিক প্রেমেই পর্যবসান! তবু নিঃসন্দেহে অশান্ত প্রমীথিয়ুস প্রকৃতিস্থ হয়েছিল এই নারীর শান্ত প্রেমের প্রভাবে। প্রায় বারো বছর ধরে গ্যেটের ভাবজীবনের নিরন্তর আত্মিক কেন্দ্র রচিত হয়েছিল এই নারীকে আশ্রয় করে। উপরন্তু শার্লট-সাহচর্যের প্রভাবেই গ্যেটে-মানসে ধ্রুপদী নিষ্ঠার উদ্‌বোধন ঘটল— জীবনে ও শিল্পে সংযম, সামঞ্জস্য ও পরিপূর্তির আবাহন হল। কিন্তু শার্লট-প্রেমের অতিরিক্ত মানস-নিষ্ঠতা ও অমূর্তরূপতা গ্যেটের পক্ষেও শেষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। তিনি সেই ভাবনিষ্ঠ প্রেমের উত্তুঙ্গ আবেশ কাটাতে চাইলেন প্রাণপণে, আর সে নিষ্ক্রমণের সুযোগ মিলল ইতালী-পর্যটনে।

ভাবসর্বস্বতার উত্তুঙ্গ শিখর থেকে লোকায়তিক ইন্দ্রিয়নিষ্ঠার স্তরে অবরোহণ গ্যেটের পক্ষে

যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। অসুস্থপ্রায় 'অমূর্ত' প্রেমানুশীলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই যেন গ্যটে স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় নিমজ্জিত হলেন— রোমের লোকায়তিক পেগান পরিবেশে। হ্বাইমারের জীবনচর্যার অনাহারে— কি রাজকার্যে কি প্রেমজীবনে কাব্যের যে মূলধারা বিশুষ্কপ্রায় হয়ে উঠেছিল, তাকে রোমক ঐতিহ্যানুসারী আদিম ভোগৈষণার বেগে আবার সঞ্জীবিত করতে প্রয়াসী হলেন গ্যেটে। তাঁর চরিত্রে এই আপাত-বিরোধী দিকটি নিঃসন্দেহে একটি স্বল্পস্থায়ী পর্যায়কে সূচিত করে। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনবেদের পরিণতি প্রাপ্তিতে এর অবদানও নিতান্ত কম নয়। কারণ কোনো নেতিবাদী অস্বীকৃতি বা আত্মবঞ্চনার উপর গ্যেটের সামগ্রিক জীবনদর্শন গড়ে ওঠে নি। বরং প্রত্যক্ষের সম্যক্ গ্রহণই তাঁর জীবনবেদে প্রতিফলিত। "বর্তমানই একমাত্র দেবী, যাঁর আমি আরাধনা করি"— এমন উক্তিও গ্যেটের কথোপকথনে নিবদ্ধ হয়েছে। গ্যেটের চরিত্রানুশীলনে সোয়াইৎসরের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "The fundamental basis of his personality, which is unchanging, is sincerity, combined with simplicity"। নিজের ও অপরের কাছে সত্য হওয়া—এই ঐকান্তিকতার মধ্যেই গ্যেটের সমগ্র নীতিবোধ বিধৃত।

বস্তুত গ্যটের সমন্বয়ধর্মী প্রতিভা বিরোধগ্রহণে পরাঙ্মুখ নয়। জীবনে ও চিন্তনে বিপরীতমুখী ধারাকে গ্রহণ করে উর্ধ্বতর সমন্বয়ী দৃষ্টিতে মিলিত করবার ক্ষমতা গ্যেটে-প্রতিভার অসাধারণ লক্ষণ। এবিষয়ে গ্যেটে যেন তাঁর সমসাময়িক দার্শনিকপ্রবর হেগেলেরই সগোত্র। বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্বপ্রক্রিয়ামূলক সমন্বয় ( dialeatical synthesis ) ছিল হেগেলীয় দর্শনের মূলসূত্র। ( অবশ্য নিছক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের প্রতি আগ্রহ গ্যেটের মধ্যে কোনোসময়েই প্রকট হয় নি। ) জর্মান এবং ইউরোপীয়-ক্লাসিক্যাল— এই দুই ধারার বলিষ্ঠ সমন্বয় সাধন করেছিলেন গ্যেটে, কারণ দুটিতেই তাঁর মানসলোক অভিষিক্ত হয়েছিল। অনুরূপ সমন্বয় ঘটেছিল সহজাত ক্ষমতা ও যুক্তিশীলতার মধ্যে, রহস্যময়তা ও সুস্পষ্টতার মধ্যে। গ্যেটের জীবন-কীর্তি ফাউস্ট-মহাকাব্যের মধ্যেও মানুষের কাম্যের ঐকান্তিক অন্বেষণের ভূমিকায় জীবনে ভালো ও মন্দের, মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিরন্তর দ্বন্দ্বই রূপায়িত হয়েছে। খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে মন্দ-তত্ত্বের স্বতন্ত্র ভূমিকা 'শয়তান'এর মারফত যে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি পেয়েছে তারই মূর্ত রূপায়ণ ঘটেছে ফাউস্ট নাটকের মেফিস্টোফিলিস চরিত্রে। সে আপনাকে ফাউস্টের কাছে 'মন্দের প্রতিমূর্তি' বলেই পরিচয় দিচ্ছে—'যে সব কিছু অস্বীকার করে'। তাঁর আপন স্বভাবের মধ্যে ভালো মন্দের দুটি দিকই সক্রিয়—এই প্রত্যভিজ্ঞাই গ্যেটের সমন্বয়ী প্রয়াসকে আরও সুতীব্র করে তুলেছে।

যেমন ভালোমন্দ দ্বন্দ্বের তেমনি দুর্বলতার সচেতনতাও গ্যেটে-মানসে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এমন কি তাঁর পক্ষে দুর্বলতা যুগধর্মিতারই অনুগ্রাহক ছিল; তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে 'মহত্তম পুরুষরা আপন যুগের সাথে কোনো না কোনো দুর্বলতার মাধ্যমেই যুক্ত থাকেন'। গভীরভাবে মানবতাবাদী গ্যেটে তাই একদিকে যেমন আপন সমসাময়িক যুগে সীমিত থাকতে অস্বীকার করেন, তেমনি আবার তাঁর জীবিতকালে ইউরোপের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফরাসী বিপ্লব এবং তার পরবর্তী নেপোলিয়ন যুগকেও কখনও উপেক্ষা করেন নি। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে গ্যেটে যৌবনের প্রায় উপান্তদেশে —তা তাঁর ভাবধারাকে স্বভাবতই আন্দোলিত ও প্রভাবিত করেছিল। তবু এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব নিতান্ত দ্বিধামুক্ত ছিল না। গ্যেটে ছিলেন দৃষ্টিভঙ্গীতে অভিজাতধর্মী— সুশিক্ষিত অভিজাত-

শাসনেই তাঁর প্রকৃত আস্থা ছিল। তবু জনগণের কল্যাণকেই তিনি আদর্শ বলে স্বীকার করেন। ফরাসী বিপ্লবের মাত্রাধিক্যে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্যে অভিজাতশ্রেণীর উচ্ছেদের স্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। আর বিপ্লবের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, সেটাকে তিনি প্রধানতঃ শাসনতন্ত্রের ত্রুটি বলেই স্বীকার করেন—জনগণের ত্রুটি বলে নয়।

যৌবনের অন্তর্দাহ ও বিক্ষোভ থেকে শান্ত আত্মসীমিতির মধ্যে উত্তরণের তাৎপর্যগভীর অধ্যায়টিকে গ্যেটে আপন ইচ্ছায় নাটকায়িত করেছেন তাঁর ইতালী পরিক্রমান্তে প্রকাশিত ক্লাসিকধর্মী নাটক "ইফিগেনিতে" ( Iphigenie )। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের নাটকের নামানুসারে এবং কাহিনী অবলম্বনেই গ্যেটে নাটকটি সৃষ্টি করেন। ভাগ্যদেবীর ( গ্রীক পুরাণের "Fates" ) তাড়নায় ক্লিষ্ট ওরিস্টিস অবশেষে হৃদয়ের শান্তি পেল এক মহীয়সী নারীর সান্নিধ্যে— অশান্ত গ্যেটে যেমন শান্তি পেয়েছিলেন শার্লট ফন স্টাইনের সুস্থিত প্রেমে। প্রেম এবং বিশুদ্ধ মানবতাই অন্তরের ক্ষত এবং অতীতের গ্লানি থেকে নির্মুক্তি করতে পারে। প্রায় তিরিশ বছর বয়সে গ্যেটে নাটকটি রচনায় প্রবৃত্ত হন, সমাপ্ত করেন প্রায় দশ বছর পরে। এই নাটকের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে যেন কবির পক্ষে মানসিক সুস্থতা অর্জনের পথ সুগম হল।

কিন্তু এই সুস্থিত বিশ্ববীক্ষণে উত্তরণ কবির পক্ষে নেহাৎ সহজগম্য হয় নি। পরিণত যৌবনে মানবস্বভাবের অবশ্যম্ভাবী সসীমতার চেতনা কবি ব্যক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু কবিচেতনার অন্তঃস্থলে মানুষের একান্ত গণ্ডীবদ্ধতার এই স্বীকৃতি প্রথম পর্যায়ে মোটেই আনন্দদায়ক হয় নি, বরং বেদনাদায়কই হয়েছে। এই বোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কবির অন্তরে এসেছে নৈরাশ্য ও অবসাদ। জীবন-জিজ্ঞাসার এই স্বল্পস্থায়ী অন্তর্বর্তী পর্যায়টি ব্যক্ত হয়েছে উক্ত "ইফিগেনী" নাটকের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায়। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে যে "ভাগ্যদেবীর গান" ( Das Lied der Parzens ) রয়েছে, তাতে মানুষের জীবনে বিধির বিধানে চূড়ান্ত প্রভাব নির্দেশ করা হয়েছে। "দেবতাদের ভয় পায় মানবজাতি; দেবতারা শাশ্বত শাসনে প্রভুত্ব করেন, আর আপন খুশিমত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।" ভাগ্যদেবীদের এই গানে নিয়তির দৃষ্টিতে মানুষের সীমিত অসহায় অবস্থাকেই যেন বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু এই আত্মপরাভবের গ্লানিতে গ্যেটের জীবনবীক্ষণের পরিণতি নয়। তাকে উত্তীর্ণ হয়ে এক মহত্তর আত্মসমর্পণ-বোধের প্রতিষ্ঠাতেই তার সম্যক পরিপূর্তি।

**অন্তপর্ব**

গ্যেটের পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিবস উপলক্ষে শীলার তাঁকে যে পত্র লেখেন তা গ্যেটে-প্রতিভার সপ্রশংস বিচারে মুখর। শীলার লেখেন, 'ধীরভাবে বিশ্লেষণ করে যার অনুসন্ধান করা হয়, আপনার অভ্রান্ত অনুভবে তা তো ধরা পড়েই, বরং আরও বেশি কিছু; আর তা সমগ্রভাবে আপনার মধ্যে রয়েছে বলেই নিজের সম্পদ আপনার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে।' তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগীর এই পত্রের উত্তরে গ্যেটে সানন্দে স্বীকার করেন যে তাঁর সত্তার সারমর্ম শীলার উদ্ধার করেছেন। এবং তাঁকে আন্তর ঐশ্বর্যের আরও সজীব অনুশীলনে গভীর উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। এই আত্মপরিচয়ের অনুশীলনই গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবনপটে গাঁথা রয়েছে, তাঁর রচনার অন্তরে প্রবেশ করলে এই গভীরতর আত্ম-অনুধ্যানেরই পরিচয় মেলে।

গ্যেটে একটি পত্রে ( Zelterকে লিখিত ) এই সত্যটির প্রতি নির্দেশ করেছেন: কেউ যদি চান ভাবীপুরুষের জন্য এমন কিছু রেখে যেতে যা থেকে তাঁরা লাভবান হতে পারেন তবে সেটা হচ্ছে অঙ্গীকার।

অবশ্য গ্যেটের জীবনে ও শিল্পে আত্মানুসন্ধানের এই নিরন্তর চর্চা অহমিকাকে সূচিত করে না। তরুণ গ্যেটের আত্মমুখীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অহংনিষ্ঠা হ্বাইমার জীবনের প্রথম পর্বেই ( প্রাক্-ইতালীয় ) উন্নীত হয়েছিল সনাতনী বিষয়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মহত্তর বিষয়মুখীনতায় এই উত্তরণ 'ফাউস্ট' মহাকাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বৈপরীত্যে প্রতীয়মান হয়।[১] ফাউস্টের আত্ম-উদ্ঘাটনের ম্যাজিক-আশ্রয়ী বিষয়ীগত জগৎ নিয়েই প্রথম খণ্ড প্রধানত রচিত; আর দ্বিতীয় খণ্ডে আত্মিকজগৎ থেকে বিষয়গত জগৎই প্রাধান্য পেয়েছে। সে জগতে বরং স্থান পেয়েছে পুরাকীর্তি, ধর্ম ও শিল্প, আর প্রকৃতির রূপান্তরকারী বিজ্ঞান। প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে গ্যেটের নিজের উক্তি বিচার্য, "এটা প্রায় সম্পূর্ণই আত্মগত; এটা এক বিভ্রান্ত, সীমিত ও অতিরাগরক্ত স্বভাবের প্রকাশ।" অপর দিকে দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, এর অভিনয় বিস্তৃততর দৃশ্যপটে; যে মানুষ জগতের মধ্যে বাস করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নি, তার পক্ষে এটা বোঝা দুষ্কর। প্রথম খণ্ডে ফাউস্ট স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিমাত্র— অন্য ব্যক্তির সাথে তার যোগসূত্র সংকীর্ণ। আত্মানুসন্ধানে তার সহকারী হয়েছে ইন্দ্রজাল। আর দ্বিতীয় খণ্ডে ফাউস্ট জাগতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ, মানুষের কর্মপ্রয়াসে ও গঠনব্যাপারে সে অংশীদার। সাথে সাথে দেখি সনাতনী জগতের ভীতি, তমসা ও রহস্য এবং অতিমানবিক শক্তিপুঞ্জ মিলে এমন এক পরিবেশ রচনা করেছে, যা অতিব্যক্তিক এক জীবনেরই পরিচয় বহন করে। সে রহস্যের পটভূমিকায় মহত্তম মানুষও যেন নিমিত্তমাত্রে পরিণত হয়।

এই মহানাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে যেমন, গ্যেটের আপন জীবনের শেষ অঙ্কেও তেমনি গ্যেটে বস্তুগত শক্তিকেই স্বীকার করে নিলেন। ফাউস্টের প্রথম পরিচয় অসহিষ্ণুতার, আত্ম-অপরিতৃপ্তির। নিজের মধ্যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের অসীম ক্ষমতা সঞ্চারের জন্য আবাহন করেছেন তিনি নানা আধিদৈবিক শক্তিকে। আপনাকে নিয়েই ফাউস্ট মত্ত। ক্রমশ গ্রেৎশেনের প্রেমের মধ্য দিয়ে এবং নাটকের শেষে ( প্রথমখণ্ডে ) বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্য দিয়ে যেন ফাউস্টের অতিব্যক্তিক জগতে নিষ্ক্রমণের পথ উন্মুক্ত হল। হ্বাইমারের কর্মজীবন ও ফ্রাউ স্টাইনের শান্ত প্রেম— এ দুয়ের স্বতন্ত্র প্রভাব রোমান্টিক গ্যেটেকে ক্লাসিক সুস্থিতির পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। গ্যেটে নিজেই স্বীকার করেছেন, সমস্ত সুস্থ প্রকৃতির গতিই অন্তর থেকে বহির্বিশ্বের অভিমুখী; যা আত্মগত তাকে বিষয়গত করাই গ্যেটের লক্ষ্য। আবার "প্রবচন ও চিন্তন"এর ( Maxims and Reflections ) মধ্যে শিল্পসাধনা এবং জগৎ-চেতনার সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে গ্যেটে বলেছেন: শিল্পচর্চার চেয়ে জগৎ-পরিহারের শ্রেষ্ঠতর উপায় আর নেই, আবার জগতের সাথে আপনার সংযোগ সাধনের উপায়ও শিল্পের চেয়ে অব্যর্থতর আর কিছু নেই। প্রথম যৌবনের রোমান্টিক দুঃখবিলাসে যদি বা প্রথম পথটি গ্যেটেকে আকৃষ্ট করেছিল, তাঁর পরিণত জীবনদৃষ্টি বরং সন্নিবদ্ধ হয়েছিল শিল্পের এই দ্বিতীয় ভূমিকাতেই।

---

১ প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে এই মহাকাব্য রচনার সূচনা হয়, আর গ্যেটের একাশী বছর বয়সে দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি; পুরো প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, গ্যেটের বয়স তখন পঞ্চান্ন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গ্যেটের স্বভাবনিষ্ঠ অভিজাতসুলভ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা মধ্যবয়সে এক কাব্যিক নিঃসঙ্গতার উপক্রম করেছিল। এবং সে নিঃসঙ্গতা থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় মিলেছিল কনিষ্ঠ সমসাময়িক যশস্বী কবি-নাট্যকার শীলারের ( Fridrich Schiller ) সাথে গভীর ও বিচিত্র সখ্যের মধ্যে। গ্যেটে ও শীলারের মধ্যে এই ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় ১৭৯৪ সালে। বিচিত্র এই যে, এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের আদিপর্বে একে অপরজনকে তাঁর বিপরীত বলেই মনে করতেন এবং পরস্পরের প্রতি বিচিত্র এক ঈর্ষামিশ্রিত গুণগ্রাহিতা ও আকর্ষণ প্রকট ছিল। উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান দশ বছর— গ্যেটে অগ্রজ। গ্যেটের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর শীলার এক বন্ধুকে লেখেন : "আমার সন্দেহ আছে আমরা ( শীলার ও গ্যেটে ) কখনও অন্তরঙ্গ হব কিনা।... তাঁর জগৎ আমার জগৎ নয়, আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত ভিন্ন বলে মনে হয়।" দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সৃজনকুশলতা, অভ্যাস— সব কিছুই ভিন্ন ছিল সন্দেহ নেই। এই অনুপম বন্ধুত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে "Genius and Character" গ্রন্থে Emil Ludwig লিখেছেন : 'শীলার চান শাসন করতে, গ্যেটে চান সাধন করতে। শীলারের কাছে জীবন আসে শিল্পের পর, যে কারণে তাঁর ভোগৈষণা এত অসমঞ্জস। গ্যেটের কাছে জীবন শিল্পের মূলে, তাই শিল্প আপনা থেকে প্রস্ফুটিত হয়। শীলার যখন অনুভব করেন, তখন সর্বদাই চিন্তা করেন ; গ্যেটে যখন চিন্তা করেন, তখনও প্রত্যক্ষ করেন'। ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব নিয়ে উভয়ের অভিজ্ঞতার তফাৎ রয়েছে— শীলার সরবে জগতের সাথে সংগ্রাম করেন, গ্যেটে নীরবে তাঁর শয়তানের সাথে যুঝে যান। এক কথায় লুড্‌হ্বিগের ভাষায়, শীলার লড়াই করেন, গ্যেটে বাড়েন। ("Schiller battles, Goethe grows.") তবু গ্যেটের যখন পঁয়তাল্লিশ ও শীলারের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, তখন থেকে উভয়ের মধ্যে যে সৌহার্দ্যের সূচনা হয়েছিল, এগারো বছর ধরে ১৮০৫ সালে শীলারের মৃত্যু পর্যন্ত তার গতি অব্যাহত থাকল। এই সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রেও গ্যেটের অহম্-উত্তীর্ণ সমন্বয়ী প্রতিভারই পরিচয় মেলে।

গ্যেটের স্বভাবমূলে যে আভিজাত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা নিছক বহিরঙ্গতায় পর্যবসিত হয় নি ; সেটা কবির একান্ত আত্মস্থতারই নামান্তর। তরুণ কবির প্রথম সার্থক গ্রন্থ হ্বার্থার উপন্যাসের চমকপ্রদ সাফল্যেও জনপ্রিয়তার প্রতি গ্যেটের কথঞ্চিৎ ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ( ১ম পর্ব )। জনতার মনোরঞ্জনে এই নির্বেদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টমাস মান বলেছেন, এটা অভিজাত-মানবতাবাদী প্রত্যাখ্যানেরই ( aristocratic-humanistic refusal ) নামান্তর। এই নির্লিপ্ততাই প্রকাশ পেয়েছে গ্যেটে-সংলাপের অনুলিপিকার সুধী একারমানের ( Eckermann ) প্রতি গ্যেটের এই উক্তিতে যে, তাঁর এইসব অনুলিপি হয়তো জনপ্রিয় হবে না। অবশ্য এতে একারমান আন্তরিকভাবে ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন। লোকপ্রিয়তার প্রতি উপেক্ষার পরিপোষক যে আভিজাত্য গ্যেটের উত্তরজীবনে বিশেষভাবে প্রকট হয়, তার মূল নিহিত ছিল গ্যেটে-চরিত্রের গভীরে।

মহাকাব্যের নায়ক ফাউস্টের বিভিন্ন ভূমিকায় গ্যেটের মানস-জীবনের বিচিত্র রসায়নেরই বিভিন্ন পর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে নায়কের জীবনের বিশেষ সমস্যাগুলির সূত্রায়ণে। যৌবনে যে ফাউস্টকে গ্যেটে রূপায়িত করেছেন, সে ফাউস্ট যেন অসুর টাইটানের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী সংগ্রামী, আর সে প্রণয়লীলায় ভাস্বর। কিন্তু ইতালী পর্যটনান্তে চল্লিশোত্তর গ্যেটের হাতে যে ফাউস্ট ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করল, তার ভূমিকায় হেলেনার বিয়োগান্তক কাহিনীই মুখ্য ( ২য় খণ্ড )। আর প্রৌঢ়ত্বের পরিণত বয়সে যে ফাউস্টের

সৃষ্টি, তার ভূমিকা সজ্জিত হয়েছে প্রকৃতিগ্রাহী রহস্যবাদে যার সাথে এসে মিলেছে পুনর্জীবনের, অমরত্বের চিন্তা। আদিযৌবনের রোমান্টিকধর্মী বীররস এবং পরিণত যৌবনের বুদ্ধিনিষ্ঠ সংশয়মুখীনতা প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে পরিণত হয়েছে শান্তরসে। এই পর্যায়ের সাধারণ লক্ষণ যে শান্তরস, তার অবশ্য পূর্বাভাস মেলে কবির যৌবনে রচিত ( মাত্র ৩১ বছর বয়সে ) একটি ছোটো কবিতায়—"পান্থজনের নৈশগীতি" ( Wanderers Nachtlied ) :

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
সব শান্ত স্তব্ধ
কোনো বৃক্ষচূড়ার কুলায়ে
কোনো সাড়াশব্দ
শোনা যায় না আর।
পাখীরা ঘুমায় গাছে গাছে।
ধৈর্য ধরো লগ্ন এল কাছে
শান্ত হবে তুমিও এবার।[১০]

হৃদয়ের শান্তির সন্ধানে যৌবনকালে কবিকে নিরন্তর যুঝতে হয়েছে। হ্বাইমার-বাসের প্রথম পর্যায়ে একদা ভ্রমণরত গ্যেটে পাহাড়-ঘেরা নিস্তব্ধ এক আরণ্যক পরিবেশে পর্বতশিখরে বসে প্রকৃতির অন্তরে বিরাজমান নিবিড় শান্তি উপলব্ধি করেছিলেন, আর সেখানেই কুটিরস্থ কাঠের দেয়ালে লিখে রেখেছিলেন এই পংক্তিগুচ্ছ। ( সুদীর্ঘ একান্ন বছর পর—মৃত্যুর মাত্র মাস ছয়েক পূর্বে, ১৮৩১ সালে—স্থবির গ্যেটে আবার একবার সে জায়গায় খুঁজে আসেন, আর "পান্থজনের নৈশগীতি"তে অভিব্যক্ত তাঁর পরিণত যৌবনের ভাবটিতে যেন অবগাহন করেন! )

যে শান্তরসলীন অন্তর্দৃষ্টির ইঙ্গিত উদধৃত কবিতাটি স্পষ্ট বহন করে, তা জীবনবীক্ষায় সাধন করতে কবিকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল—অনেক সংঘাত-বেদনার মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। আলোর পথেরই অভিযাত্রী গ্যেটে, অন্তরের মুক্তির অভিসারী তিনি। হতাশা, নেতিবাদ, দুঃখাত্মক জীবনদৃষ্টি তাঁর আত্মিক অভিযানে সাময়িক পর্যায়মাত্র। কষ্ট স্বীকারের আত্মনিগ্রহেরও প্রয়োজন আছে পরিশুদ্ধ জীবনবেদকে অর্জন করবার জন্য। কারণ সে জীবনবেদ ক্ষুদ্র অহমিকাকে, অহংনিষ্ঠ বস্তু নির্বেদকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবন অনুশীলন করলে দেখতে পাই সমাহিত জীবন-নিস্পৃহতা তিনি অর্জন করেছেন জীবনবিমুখতার মধ্য দিয়ে নয়, বরং সুখদুঃখের অধিষ্ঠান জগতের কেন্দ্রে অবস্থান করেই। নিজের সমস্ত কর্মকে, এমন-কি তাঁর আনন্দ ও অতিরক্তিকেও তিনি যাচাই করেছেন আপন ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পের উপর তাদের প্রভাবের মাধ্যমে।

"ফাউস্টে"র সূচনাতেই ( "দেবলোকে অবতরণিকা"—"Prologue im Himmel" ) পরমপ্রভুর মুখ দিয়ে এই চূড়ান্ত সত্যটি গ্যেটে উত্থাপন করেছেন—মানুষ যতক্ষণ তার অভীপ্সার তাড়ণায় সংগ্রাম করে চলে, তার পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক ( "Es irrt der Mensch so lang er strebt" )। ভ্রান্তি মানবিক ধর্ম,

[১০] বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদ, "জর্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা," সম্পাদনা ধীরেন মুখোপাধ্যায়, দীপায়ন।

কিন্তু তার উদ্ভব মানুষের স্বভাবসুলভ অহংনিষ্ঠা থেকে। মানব-স্বভাবের গতিময় সংগ্রামশীলতাকে মেনে গ্যেটে খ্রীষ্টান তথা ইউরোপীয় ঐতিহ্যের মর্মকথাকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সসীম মানুষের এই সংগ্রামশীলতা নিছক অন্ধ প্রবৃত্তি নয়, এটা ঊর্ধ্বমুখী লক্ষ্য দ্বারা সঞ্জীবিত। এই প্রসঙ্গেই নাটকের অবতরণিকায় বলা হয়েছে যে মানুষ কল্যাণকামী, তার দ্বিধাজড়িত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেই প্রকৃষ্ট পন্থাটির চেতনাই অনির্বাণ থাকে।[১১] চিরকল্যাণের ও আনন্দের এই ধ্রুবচেতনায় উত্তরণ গ্যেটে-চরিত্রের ও প্রতিভার অন্তিম পর্যায়কে মহীয়ান্ করে তুলেছে।

সৌন্দর্যসাধক গ্যেটের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যপিয়াসীর দৃষ্টি নিয়েই গ্যেটের কবিচেতনার সূচনা ; এই সৌন্দর্যানুশীলনের আগ্রহে গ্যেটে কল্যাণের আদর্শকে উপেক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। সে পর্যায়ে তাঁর অভিমত ছিল— সুন্দর মঙ্গলের অধিক, কারণ মঙ্গল সুন্দরেরই অন্তর্বর্তী। ইংরাজি সাহিত্যের রথী অস্কার ওয়াইল্ডও এই অবিমিশ্র সৌন্দর্যবাদী মতের প্রচারক ছিলেন। কিন্তু এই সৌন্দর্যসর্বস্বতায় গ্যেটের প্রতিভা ক্ষান্ত হয় নি, ওয়াইল্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। ওয়াইল্ডের শেষ কথা নিছক সৌন্দর্যসাধনা ; উত্তরপর্যায়ে গ্যেটে আর বিশুদ্ধ শিল্পচর্চাকেই চরম ও পরম বলে স্বীকার করেন নি।[১২] তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে পরম কল্যাণের আদর্শের প্রতি, যা কালোত্তর তার প্রতি। গ্যেটে তাঁর পরিণত জীবনবেদকে সূত্রিত করেছিলেন এই ব'লে যে, মানুষকে বাঁচতে হবে কল্যাণের ও সুন্দরের জন্য, এবং সবার সুখের জন্য— জগদ্ধিতায়। এই সুস্পষ্ট মঙ্গলবোধেই গ্যেটের শিল্পসাধনার পরিসমাপ্তি, সৌন্দর্যপিয়াসী শিল্পীসত্তা গ্যেটে-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় নয়।

নবীন গ্যেটে যেমন উত্তুঙ্গ রোমান্টিক ভাববাদে নিবিষ্ট হয়েছিলেন, প্রবীণ গ্যেটে তেমনি এক মহত্তর বাস্তববাদে উপনীত হলেন— যা প্রায় মরমিয়া রহস্যবাদেরই ( mysticism ) এক অভিব্যক্তি। উভয়ের অন্তর্বর্তী ছিল পরিণত যৌবনের সংশয় ও দ্বন্দ্ব। ভাবাকুল আত্মলীনতার প্রান্ত থেকে সচেতন দ্বিধাসংশয়ের মধ্য দিয়ে কবি উত্তীর্ণ হলেন সম্বুদ্ধ ক্ষান্তিতে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাভাবিক ক্রমানুসারী জীবনদর্শনের ব্যাখ্যানে গ্যেটে এই অভিমত পোষণ করতেন ("Maxims and Reflections") যে, বিভিন্ন বয়সে মানুষ বিভিন্ন জীবনদর্শনে সাড়া দেয়। শিশু আত্মপ্রকাশ করে নিছক বাস্তববাদীর ভূমিকায় ; আর যুবা হয় আন্তর আবেগে মথিত, তাই সে আত্মসচেতন, আর ক্রমে যেন পরিণত হয় ভাববাদীতে। যৌবনের এই ভাববাদী দৃষ্টি ক্রমে আচ্ছন্ন হয় সংশয়বাদে ; আর পরিণত যৌবনের সংশয়নিষ্ঠাকে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি যথার্থ উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তবে ক্রমে প্রৌঢ়ত্বের পরিক্রমার সাথে সাথে মরমিয়াবাদী দৃষ্টির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। গ্যেটের ক্ষেত্রে এই অন্তিম পর্যায়ে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল।

১১ দ্রষ্টব্য "A good man, through obscurest aspiration,
Has still an instinct of the one true way".
*Faust*, "Prologue in Heaven", (trans. Taylor).

১২ তুলনীয় ওয়াইল্ডের জীবনীকার Frank Harris-এর মন্তব্য : "Oscar Wilde stopped where the religion of Goethe began, he was far more of a pagan and individualist than the great German".

যে শান্তরসের আবাহন গ্যেটের যৌবনকালের কবিতাটিতে ("পান্থজনের নৈশগীতি") লক্ষিত হয়, এবং যে শান্তরসের আভাস গ্যেটের উত্তররচনায় অনুস্যূত হয়ে আছে, তারই গভীরতর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে গ্যেটের বিশিষ্ট রচনায়— ১৮১৯ সালে প্রকাশিত প্রতীচ্য-প্রাচ্য-সঞ্চয়ন (West-Oestlicher Diwan)। প্রজ্ঞা ও প্রেমের কাব্য এই সঞ্চয়ণ; বিশেষত হাফিজের পারসী রচনার অনুবাদ পড়ে গ্যেটে এই কাব্য প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন (১৮১২)। তদানীন্তন ইউরোপ নেপোলিয়নের যুদ্ধযাত্রায় বিপর্যস্ত ও ক্লান্ত; সমসাময়িক কালের এই ঝঞ্ঝাবাত্যায় গ্যেটেও যেন শ্রান্তপ্রায়। মানবতাধর্মী শাশ্বতরসের পিয়াসী গ্যটে আপনার জন্য একান্তভাবে নির্জনতার অবকাশ সন্ধান করছিলেন। প্রায় চারশো বছরের অগ্রসূরী পারস্যের এই মরমিয়াবাদী কবির জীবনে ও কাব্যে গ্যেটে যেন আত্মীয়তাসূত্র আবিষ্কার করলেন। নেপোলিয়নের সমসাময়িক এবং ধর্মভ্রষ্ট বলে বহুল পরিচিত ইউরোপের এই কবি তাঁর নিয়তি ও মানসের সহমর্মী পেলেন প্রাচ্যের সেই হাফিজের মধ্যে— যিনিও প্রথমে বিধর্মী বলে আপন সমাজে গণ্য হয়েছিলেন ও পরে গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আর যাঁর ভাগ্যে একদা ঘটেছিল নিষ্ঠুর তৈমুরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। অবশ্য গ্যেটের প্রাচ্যালোকে এই অবগাহন তাঁর স্বকীয় জীবনবেদ থেকে তাঁকে উৎক্ষিপ্ত করে নি; বরং গীতিকবিতাগুলি তাঁর আপন হৃদয়রাগেই রঞ্জিত, আর রূপায়িত করেছে তাঁর উপলব্ধিকে প্রাত্যহিক অনুভূতি ও চিন্তার সংযোগে।

এই সঞ্চয়ণের প্রথম সর্গের একটি কবিতায় কবি সন্নিবদ্ধ করেছেন তাঁর সুপরিণত জীবনবেদ— তাঁর সংজ্ঞান ও বিশ্ববীক্ষণ সূত্রায়িত হয়েছে তাতে। সার্থক নাম কবিতাটির; "কৃতার্থ অভীপ্সা" (Selige Sehnsucht)। কবির 'কৃতার্থ অভীপ্সা' ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে:

বলি আমি শুধু প্রাজ্ঞজনের তরে—
জনতা হবে যে বিদ্রূপে মুখরিত—
বন্দনা করি সেই জীবন্তেরে,
অগ্নিশিখায় মরণ কামনা ব্রত।

শিখাময় অবলুপ্তির অভিসারী যে জীবন, তারই পূজারী কবি। মিলন-বিরহের আনন্দ-বেদনায় মানব-প্রেমের যে সার্থক রূপায়ন, তারই মধ্যে কবি এই অভীপ্সার সাক্ষ্য খুঁজে পান। "যে প্রণয়রজনীর স্নিগ্ধতায় সৃষ্টির লীলা চলে, তার মধ্যে বিচিত্র অনুভূতি তোমায় এসে অভিভূত করে— আর তখন জ্বলতে থাকে শান্ত প্রদীপখানি।" "আঁধারের আবরণে তুমি আর আচ্ছন্ন থাকবে না, ঊর্ধ্বতর মিলনের নূতন কামনায় তুমি আবার উন্মুখ হবে।"— আত্ম-উন্মোচনের সার্থক পর্যবসান নিছক মানবিক প্রেমের মধ্যে নয়, তাকে উত্তীর্ণ হয়েই সম্ভব। ঊর্ধ্বতর সত্যের পানে যে আকুতি তা আপনাকে দগ্ধ করতে উদ্যত হয় পতঙ্গেরই মতো। "কোনো ব্যবধান তুমি সইতে পার না, তাই উড়ে আস তুমি যে বিমুগ্ধ। অবশেষে দগ্ধ তুমি, হে পতঙ্গ আলোলোভাতুর!" কিন্তু কবি জানেন, এ দহন প্রকৃত বিনাশ নয়, এ তন্ময়তারই নামান্তর, ঊর্ধ্বতর সত্তাতে এর উত্তরণ। তাই সমাপ্তিতে কবি বলেছেন: "মৃত্যু আর পুনর্ভব: এ দুয়ের বিহনে ম্লান এই পৃথিবীর বুকে শুধু বিষণ্ণ অতিথি হয়ে বিরাজ করা ছাড়া তোমার আর গতি কি!"

প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সের এই কবিতাটি নিঃসন্দেহে এক অন্তর্নিহিত ধর্মবোধের সাক্ষ্য বহন করে। সার্বিক সত্যের কাছে অন্তর থেকে সমর্পণের সুর কবিচেতনায় ইতিপূর্বেই ( মধ্যম পর্বে ) পরিস্ফুট হয়েছিল। এখন পরিপক্ক জীবনবোধে সে সুরের সাথে এসে মিলল অমরত্বের প্রতীতি। জীবনের উদ্দেশে মৃত্যুকে বরণ করবার যে নির্দেশ ( "die to live" ) হেগেলীয় দর্শন থেকে উদ্ভূত, তারই যেন কাব্যিক রূপায়ণ লক্ষিত হয় এই কবিতার মর্মবাণীতে। জীবনের উপর গ্যেটের অগাধ বিশ্বাস ; সে বিশ্বাসে মরণের বিয়োগান্তক রূপটিও অন্তর্হিত। মৃত্যু তাঁর শত্রু নয়, বরং গোড়া থেকেই তিনি মৃত্যুর সাথে সখ্যসূত্র স্বীকার করে এসেছেন। পুনর্জীবনে গ্যেটে বিশ্বাসী। সুদীর্ঘ আট দশক ধরে তাঁর জীবনের ভূমিকা পাতা, জীবনের শেষ পরিপূর্ণতারূপেই মৃত্যুকে তিনি অবলোকন করেন। খ্রীষ্টমতাবলম্বী হয়েও এক এক বিশ্বাতীত ঈশ্বর-ব্যক্তিতে বিশ্বাসেই গ্যেটের জীবন-দর্শনের পরিণতি নয়। তা উত্তীর্ণ হয়েছিল বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রকাশমান পরমসত্তার সাথে প্রকৃতির ঐক্যের বোধে। এই বিশ্ববীক্ষাই গ্যেটে উপস্থিত করেছেন 'ফাউস্টে'র দ্বিতীয় খণ্ডে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান তা ঐশীশাশ্বতেরই প্রতিবিম্ব—'যা কিছু অনিত্য তা শুধু যেন প্রতিরূপ'। "প্রবচন ও চিন্তনে'র মধ্যে যথার্থ প্রতীকতার ( symbolism ) স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে গ্যেটে বলেছেন : যেখানে বিশেষ হয়েছে সার্বিকের প্রতিভূ— ছায়াবিগ্রহ নয়, অচিন্ত্যের জীবন্ত প্রকাশ— সেখানেই যথার্থ প্রতীক।"

তাঁর বিরাশীতম—এবং অন্তিম— জন্মবার্ষিকীতে গ্যেটে 'ফাউস্টে'র দ্বিতীয় খণ্ডের সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি তাঁর মৃত্যুর পর খুলে প্রকাশ করবার উদ্দেশে সিলমোহর করে রাখেন (১৮৩১)। এই প্রসঙ্গে একারম্যানকে তিনি বলেন : 'এখন থেকে আমার জীবনকে এক বিশুদ্ধ উপহারের দৃষ্টিতে দেখব।' এর পর মাত্র সাত মাস কবি বেঁচে ছিলেন। নিজের জীবন নিয়ে এই নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তিই ব্যক্ত হয়েছে আশী বছর বয়সে 'ফাউস্টে'র ফরাসী অনুবাদ প্রসঙ্গে কবির মন্তব্যে। তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর মহাকাব্যে বর্ণিত মানবাত্মার ক্রমপরিণতির পর্যায়গুলি— বেদনা, বিক্ষোভ, বিরাগ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে। আর সে প্রসঙ্গে বলেছেন : 'গ্রন্থকার এখন এসব পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন।··· আর ইতিমধ্যে সংসারের রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, আনন্দ-বেদনায় মানুষের অবস্থা অনেকটা একই রয়ে গেছে।'

লৌকিক জীবনের সাথে অতি-লৌকিক মহিমার, পার্থিব সত্তার সাথে ঐশ্বরিক সত্তার ঘনিষ্ঠ সেতুবন্ধনেই গ্যেটের বিশ্ববীক্ষার পরাকাষ্ঠা। জগৎ ও মানুষের সাথে সুদীর্ঘ আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় যে বিচিত্র রসঘন পট আপন জীবনে রচিত হয়েছিল, তারই মাধ্যমে গ্যেটে উপলব্ধি করেছেন মানবজীবনের মহিমা—অসীমের পটভূমিকায়। যে ফাউস্ট স্বভাবত অপরিপূর্ণ, তার মুক্তি ঘটল শেষ পর্যন্ত অপার্থিব প্রেমের প্রভাবে। সে প্রেমের উৎস শাশ্বত নারী--- তাঁরই সাহচর্যবোধ ও করুণার স্বীকৃতি গ্যেটের কাব্যে ও জীবনে ক্রিয়মান। সেই অমর্ত্য মহিমা পৃথিবীর নারীর মধ্যে প্রকাশমান। খ্রীষ্ট-জননী মেরীর দেবীমূর্তির মধ্যেই গ্যেটে শাশ্বত এই নারীরূপের চরিতার্থতা খুঁজে পান। সেই চিরন্তনী কল্যাণময়ী শক্তির বন্দনায় নাটকের পরিসমাপ্তি : শাশ্বত সেই নারী আমাদের ঊর্ধ্বপানে আকর্ষণ করেন। ( "Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan." )[১৩]

---

১৩ All things transitory
But as symbols are sent;

দ্বন্দ্বমুখর পার্থিব জীবনকে তার সমগ্র সসীমতায় গ্রহণ করেও ঐশী চেতনার অভিমুখী হওয়া— গ্যেটের জীবন ও কাব্যের এই মর্মকথা। 'যা কিছু অনুসন্ধেয় তার অনুসন্ধান করা আর যা অনুসন্ধানের অগম্য তাকে শান্তভাবে শ্রদ্ধা করা'— এই জীবনবেদের মননদ্যুতিতে গ্যেটে-প্রতিভা চিরভাস্বর।

Earth's insufficiency
Here grows to Event:
The Indescribable,
Here it is done:
The Woman-Soul leadeth us
Upward and on!

*Faust*, Part II, (trans. Bayard Taylor)

বিষ্ণুপুর ঘরানা। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। পাঁচ টাকা।

সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯। ছয় টাকা।

ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত। শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা ৯। আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিষ্ণুপুরে বহুকাল থেকে ধ্রুপদের বিশেষ চর্চার ফলে একটি বিশিষ্ট ধরন কায়েমী হয়ে গেছে। একেই বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানা। বিষ্ণুপুরে গায়কদের বিশ্বাস অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের দরবারে তানসেনবংশীয় বাহাদুর খাঁ তানসেন প্রবর্তিত অর্থাৎ সেনী ধ্রুপদের প্রবর্তন করেন। শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় উপযুক্ত প্রমাণসহ এই মতটি খণ্ডন করে প্রতিপন্ন করেছেন যে রঘুনাথের সময় বাহাদুর খাঁর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই বাহাদুর খাঁ আদৌ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না সে সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কারণ যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে উক্ত বাহাদুর খাঁকে বিষ্ণুপুরে সেনী ঘরানার প্রবর্তক হিসাবে গণ্য করা সম্ভব হয় না। দিলীপবাবুর মতে বিষ্ণুপুরের যে সাংগীতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার মূলে আছেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। ইনি আগ্রা অঞ্চলের কোনো প্রবীণ সংগীতজ্ঞের কাছে প্রায় দুই বৎসরকাল সংগীতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর বিশ্বাস আগ্রা মথুরা অঞ্চলের কোনো সংগীতগুণীর কাছে, তিনি যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন তা থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎপত্তি হয়েছে। রামশঙ্কর অষ্টাদশ শতাব্দীর অপরার্ধে জীবিত ছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ভূমিকায় যে মত প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হয় তাঁর বিশ্বাস সেনী ও মথুরা-বৃন্দাবনে প্রচলিত ধ্রুপদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। তিনি বলছেন—"অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বোধ হয় বলা অসমীচীন হবে না যে সেনী ও মথুরা বৃন্দাবন এই উভয় ঘরানারই মূল ও প্রেরণাকেন্দ্র ছিল গোয়ালিয়র ঘরানা। সুতরাং বিষ্ণুপুর ঘরানার মূল উৎস পশ্চিমী আগ্রা বা মথুরাবৃন্দাবন বলে গণ্য হলেও সেনী ঘরানার মতোই তার প্রাণকেন্দ্র ছিল সংগীত-পীঠস্থান গোয়ালিয়র। অবশ্য পরে তারা স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

পুস্তকটিতে নটি প্রধান অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে—ঘরানার কথা, বিষ্ণুপুর ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎপত্তি—প্রচলিত মত, রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের কথা, বাহাদুর খাঁর জীবনকাল, বাহাদুর খাঁর বিষ্ণুপুরী শিষ্য, বিষ্ণুপুরের সংগীতগুরু রামশঙ্কর, রামশঙ্করের গুরুকরণ এবং বিষ্ণুপুর সেনী ঘরানার বহির্ভূত এই মতস্থাপন। গ্রন্থশেষে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের বংশতালিকা দেওয়া হয়েছে এবং শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য ও স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিষ্ণুপুর সম্বন্ধীয় আলোচনা যোজিত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেউ সংশয় প্রকাশ করেন নি, কারণ এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেন নি। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী আলোচনা করে দেখালেন যে বাংলার সাংগীতিক ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের পুনরালোচনার বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে গবেষকদের সচেতন করে দিয়ে তিনি মহৎ উপকার করেছেন।

বিষ্ণুপুরের তথাকথিত ইতিহাসে যে সময় বাহাদুর খাঁকে স্থাপন করা হচ্ছে সেই সময় তাঁর অস্তিত্ব সম্ভব নয় এটি এই পুস্তকে যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে তানসেনের বংশপঞ্জী বা অপর যে সব উপাদান লেখক সংগ্রহ করেছেন সেগুলির বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। তানসেন বা সেনীধারা নিয়ে বর্তমানে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে কেউ মুঘলযুগের প্রামাণিক গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। বর্তমানে যাঁরা নিজেদের সেনীঘরের প্রচারক বলে দাবী করেন তাঁদের মতে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যায় না। সেনী ঘরানা যে কী বস্তু তাও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তানসেন নিজে কোনো ঘরানার প্রতিভূ ছিলেন না এবং তাঁর শিষ্যের সংখ্যাও খুবই কম ছিল। বিলাস খাঁ ছাড়া তাঁর অপর পুত্রদের ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় না বললে অত্যুক্তি হয় না। বিলাস খাঁ নিজে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অতএব তাঁর শিষ্যদের বিলাসখানী ঘরানার অংশীদার বলাই সংগত। তানসেনের গানগুলি বহুল পরিমাণে মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হয়ে চলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটিত করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে যখন রাগের উল্লেখ সমেত তানসেনপ্রমুখ বহু সুরকার এবং গীতকারের গানের সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে তখন বিভিন্ন ধ্রুপদী এইসব গানে দ্রুত সুর সংযোগ করে এগুলিকে নিজ নিজ ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। এই ব্যাপারটিতে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা আরও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। বিষ্ণুপুরের গানের বিশুদ্ধ ঢঙ দেখে এটা অনুমান হয় যে এখানে ধ্রুপদের একটি বিশিষ্ট শুদ্ধরীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এই রীতি তথাকথিত সেনীরীতির অনুবর্তী নয়। তথাপি যাকে আমরা সেনীধারার গান বলি তা যে বিষ্ণুপুরে প্রচলিত হবার চেষ্টা হয়েছিল এটি প্রমাণিত হয় এই কারণে যে বহু সেনী গীতি বিষ্ণুপুরে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত আছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের গায়কেরা বোধ হয় নিজেদের প্রাচীন রীতিকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি তাই তাঁরা অধিক অলংকার যোগ করে এইসব গান পরিবেশন করেন না অথচ ধ্রুপদের সংগঠনকে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেন।

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রামশঙ্করের সংগীতশিক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন তা অবিশ্বাস করবার কারণ নেই, তবে বিবৃতিটি আরও প্রমাণনির্ভর হলে পাঠকদের প্রতীতি দৃঢ়তর হত।

বিষ্ণুপুর সেনীসংগীতের প্রতিষ্ঠা নিয়েই গৌরব অর্জন করে নি উত্তম ধ্রুপদে তার বহুকাল থেকেই অধিকার ছিল। তথাকথিত সেনবংশীয় বাহাদুর খাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব না থাকলেও বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের পূর্বে সংগীতকল্পতরু নামক একটি সংগীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এ খবর খুব কম লোকেরই জানা। এই গ্রন্থটি পুনরায় আবিষ্কার করে লেখক স্বামীজির জীবনের একটি দিক সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। সঙ্গীতকল্পতরু গ্রন্থটি ১২৯৪ সালে অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে ১১৮নং অপার চিৎপুর, কলকাতা, আর্য পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত হয়। লেখকের নামের স্থলে মুদ্রিত ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. ও বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। বইটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং কয়েক বছর ধরে সাধারণে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থের দুটি বিভাগ ছিল। একটি গীতিবিভাগ অপরটি তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা। বইটি সর্বাংশে স্বামীজির প্রচেষ্টাতেই রচিত হয়। কয়েক বছর পরে সঙ্গীতকল্পতরু নামটির বিলোপসাধনপূর্বক বৈষ্ণবচরণ বসাক গ্রন্থটিকে

সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত নামে প্রকাশ করেন এবং উক্ত গ্রন্থ থেকে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামটিও বিলুপ্ত হয়। সে যুগের তুলনায় গ্রন্থের গীতসংগ্রহটি বিশেষ প্রশংসনীয়। স্বামীজির নিজের চেষ্টায় এই সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল।

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থে কেবলমাত্র তত্ত্ব অংশটি মুদ্রিত করেছেন। বর্তমানে হয়ত এই তত্ত্ব অংশের খুব গুরুত্ব নেই কিন্তু যখন সঙ্গীতকল্পতরু রচিত হয়েছিল তখন এই আলোচনার যথেষ্ট আবশ্যকতা ছিল। বিবেকানন্দ আমাদের সংগীতসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এই প্রযত্নে সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। লেখক এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র সংগীতজীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে বইটিকে তথ্যনিষ্ঠ করে তুলেছেন। বিবেকানন্দের সংগীতজীবন সম্বন্ধে এই নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থটি বর্তমান সংগীতসাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজকে বহুলভাবে উপকৃত করবে।

সংগীতকে নিছক গাণিতিক নিয়মে পর্যবেক্ষণ করে শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি আধুনিক পদ্ধতির বিবরণ প্রদান করেছেন। এর আগেও কোনো কোনো গ্রন্থে এই মতবাদ বর্ণিত হয়েছে। সা, গা, পা, নি— এই চারটি প্রধান স্বরকে তিন তিন হিসাবে ভাগ করে সগপ এবং গপন এই দুটি ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি স্বরের একত্রে নামকরণ করা হয়েছে মাতৃকা। এই ত্রয়ীস্বরের সমাবেশ অনুসারে রাগরাগিণীর বিচার করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে মাতৃকার সাহায্যে রাগরাগিণীর স্বরগঠনের পার্থক্য নিরূপণ, রাগরাগিণীর মিশ্রণের মাননির্ণয়, রাগরাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার, প্রচলিত রাগরাগিণীর ত্রুটি সংশোধন প্রভৃতি বহুতর দুঃসাধ্য কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে। লেখক যেভাবে রাগসংগীতকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাতে এই রীতি প্রয়োগ করলে নিশ্চিতভাবেই সুফল পাওয়া যাবে কারণ গণিত কখনো মিথ্যা হতে পারে না। তবে কথা হচ্ছে আমাদের সংগীত ঠিক গাণিতিক নিয়মেই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে নি তার বিকাশ বহুপ্রকারে নানা স্বতন্ত্রপদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অতএব এইটাই যে একমাত্র উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সে বিষয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া মাতৃকাপদ্ধতি যে আমাদের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি নয় এবং আমাদের রাগসংগীতের বিকাশ কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনার প্রয়োজনীয়তা লেখক অনুভব করেন নি।

স্বীয় মত স্থাপনের উৎসাহে লেখক কিছু অধিক পরিমাণে সংগীতশাস্ত্রের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ সঙ্গীতরত্নাকর সম্বন্ধে তাঁর মত উদ্ধৃত করি। তিনি বলছেন: "সঙ্গীতরত্নাকরে রাগসংখ্যা মাত্র ২৬৪টি পাইয়া নিশ্চয় মনে করিব যে রাগরাগিণীর সৃষ্টির মূলকথা তিনিও জানিতে পারেন নাই এবং ঐ বৃহৎ পুস্তকে বিভিন্ন পুস্তকাদির মতের আলোচনাই করিয়াছেন। তিনি উক্ত ২৬৪টি রাগেরও সম্যক সর্বপ্রকার উদাহরণ এবং সূত্রও উল্লেখ করিতে অপারগ হইয়া, মনে হয় পুস্তকে জটিল হইতে জটিলতর বহু অর্থযুক্ত বাক্য সংযোজনায় দুর্বোধ্য করিয়াছেন।" এই মন্তব্যে আমার এক প্রবীণ সংগীতজ্ঞের কথা মনে পড়ল। তিনিও এইরকম অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু এই মন্তব্যে এই কথাই মনে হয় যে লেখক সঙ্গীতরত্নাকরের উদ্দেশ্যই বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন। সঙ্গীতরত্নাকরে রাগসংগীতের ক্রমবিকাশ বর্ণিত হয়েছে এবং সেটি যেভাবে হয়েছ তা বিজ্ঞানসম্মত।

আমাদের ইতিহাস যেখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে সেখানে মাগধী, অর্ধমাগধী সম্ভাবিতা, পৃথুলা— এইসব গানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এইসব গীতিকে অবলম্বন করেই জাতিগায়ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল।

জাতিগুলি ষড়্‌জাদি বিভিন্ন স্বরের গুরুত্ব অনুসারে গঠিত হয়েছিল। প্রথমে ছিল সাতটি শুদ্ধজাতি। পরে এই জাতিগুলির সংমিশ্রণে আরও এগারটি জাতির উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তী যুগে পাঁচটি গীতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়; যথা— শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী। এই গীতিগুলিকে আশ্রয় করে যে গায়নপদ্ধতির বিকাশ হয়েছিল তা আর জাতি নামে পরিচিত নয় তার আখ্যা হল গ্রামরাগ। জাতিগায়নপদ্ধতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল নিবিড়। দেশদেশান্তরে এবং বিভিন্ন জাতিতে এই সব গ্রামরাগের ব্যাপ্তির ফলে বহুতর মিশ্রণ ঘটল। এই মিশ্রণ অনুসারে মূল থেকে যে পরিবর্তন সাধিত হল সেই পরিবর্তনের পরিমাণ অনুসারে তাদের নাম হল ভাষা বিভাষা অন্তরভাষা। এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি শার্ঙ্গদেব তদীয় সঙ্গীতরত্নাকরে নিজেই নির্দেশ করেছেন। ক্রমে আরও পরিবর্তন এবং মিশ্রণের ফলে যে নতুন শ্রেণীকরণ হল তার পরিচায়ক আখ্যাগুলি হচ্ছে রাগ ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ। এই পর্যায়ে আমরা দেখছি রাগসংগীত বিভিন্ন দেশী ক্রিয়াকলাপেও ছড়িয়ে পড়েছে। রাগসংগীত এইভাবে দেশীসংগীতের মধ্যে স্বীকৃতিলাভ করল। ধীরে ধীরে এই অঙ্গরাগগুলিও ক্রমাগত মিশ্রণের ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলল। তখন একটি মাত্র বৃহৎ শ্রেণী অবশিষ্ট রইল; সেটি হচ্ছে রাগ। এই বৃহৎ শ্রেণীটি নিয়েই আজ আমাদের যত তর্ক, বিতর্ক, আলোচনা।

এইটিই হল রাগসংগীতের প্রকৃত ইতিবৃত্ত। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক উভয়দিক বিচার করে সঙ্গীতরত্নাকরের মতো অপর কোনোও গ্রন্থে রাগসংগীতের আলোচনা হয় নি। রাগসংগীত গাণিতিক পথে পরিভ্রমণ করে নি, করেছে মানবিক নিয়মে ইতিহাস এবং ভূগোলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। ত্রয়ীস্বরে বিরচিত মাতৃকাতন্ত্রের মহিমাকীর্তন প্রসঙ্গে এই সত্যকে অস্বীকার করা কোনোক্রমেই সমীচীন হবে না।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

জর্জ বার্নাড শ। শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২
দশ টাকা।

বার্নাড শ-এর মৃত্যু হয়েছে পুরো পনের বছরও হয় নি কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর খ্যাতিপ্রতিপত্তি বেশ খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। আমাদের এই অতি সুসভ্য যুগে সময় অতিমাত্রায় দ্রুতগামী আর সময় যে পরিমাণে দ্রুতগামী মানুষের কীর্তি সে পরিমাণে দ্রুতক্ষয়ী। আজকে যা কীর্তিত কালকে তা নিন্দিত; আবার আজকে যার অনাদর কালকে তার সমাদর হওয়াও কিছুই বিচিত্র নয়। মানুষের রুচি ক্ষণস্থায়ী হলে নিন্দা যশও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। আমাদের ছাত্রাবস্থায় বার্নাড শ-এর নাম যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত আজকের ছাত্রমহলে সে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না। অথচ আমাদের কালে বার্নাড শ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিলেন না, এখন হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে এককালে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারত আজকে তা পারছে না। অবশ্য ছাত্রমহলের বাইরেও যে শ-এর খুব একটা প্রতিপত্তি আছে এমন মনে হয় না।

বলা বাহুল্য বার্নাড শ নিজেই এর জন্যে অংশতঃ দায়ী— সারাজীবন প্রাণপণে নতুন কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। নতুন কথা বলার বিপদ এই যে সহজেই তা পুরোনো হয়ে যায়। কথার জৌলস বেশি

দিন থাকে না, বিশেষ করে ছাপার অক্ষরে কথা। শাস্ত্রে বলেছে, শত কথা মুখে বোলো, লেখায় লিখো না। ডক্টর জনসন শাস্ত্রবাক্য মেনে চলেছেন। চমকপ্রদ কথা তিনিও প্রচুর বলেছেন। কিন্তু সেসব কথা মুখে বলেছেন লেখায় লেখেন নি। মানুষের মুখে মুখে তার প্রচার হয়েছে। মুখে মুখে যে কথা প্রচারিত হয় দিনে দিনে তার ধার এবং জৌলস বাড়তে থাকে। পুথির পাতায় ছাপার অক্ষরে কথা মিইয়ে যায়। বার্নাড শ-এর অনেক কথা মিইয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যে নতুন কথাটাই বড়ো কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমরা নতুনকে চাইনে, চাই নবীনকে। সাহিত্যে চিরকাল নতুনের চাইতে নবীন বড়। নতুন পুরাতন হয়, নবীনের নবীনতা এবং সজীবতা কখনো নষ্ট হয় না।

অমিট-রায়ের বোন সিসি বলেছিল, ও সকালবেলা উঠেই সারা দিনের মতো শানিয়ে বলা কথা বানিয়ে রেখে দেয়। শ-এর বেলায় কতকটা তাই হয়েছে। ওঁর কথাগুলি সব সময়ে জ্যান্ত নয়। নাটকের দুই চরিত্রে দুই প্রতিপক্ষ খাড়া করে wit-এর ঠোকাঠুকি চলতে থাকে, খানিকটা যেন কথার ফুলঝুরি। খানিকক্ষণ বেশ লাগে, পরে ক্লান্তি আসে। জনসনের কথা ছিল জ্যান্ত কারণ তিনি পুথির পাতায় কথা বলেন নি। বলেছেন খাবার টেবিলে, চায়ের দোকানে, বন্ধু মজলিশে। তাঁর প্রতিপক্ষ কাল্পনিক প্রতিপক্ষ নয়। নিত্যকার আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তিতর্কের ঘাত প্রতিঘাতে সেই বাক্য স্বতঃ উৎসারিত। শানিয়ে বলা কথা তাঁকে আগে থেকে বানিয়ে রাখতে হত না, শানিত বাক্য তাঁর জিহ্বাগ্রে প্রস্তুত থাকত। কথাপ্রসঙ্গে বার্নাড শ-এর মুখেও অনেক সুতীক্ষ্ণ বাক্য, অনেক সুভাষিত উচ্চারিত হয়েছে। লেখনী নিঃসৃত বাক্যের চাইতে এসব কথাই বরং অধিকতর দীর্ঘায়ু হবে।

অবশ্য বার্নাড শ কেবলমাত্র নতুন কথা বলেছেন এমন কথা বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়, খাঁটি কথাও প্রচুর বলেছেন। কিন্তু খাঁটি কথা বললেই যে খাঁটি সাহিত্য হবে এমন কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। সত্যাত্মক বাক্যকেও সর্বাগ্রে রসাত্মক হতে হয়। বলা বাহুল্য তাঁর অনেক খাঁটি কথা অর্থাৎ সত্য কথা রসের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছে। সাহিত্যে ওটাই অগ্নিপরীক্ষা। তথাপি সাহিত্যে যতখানি সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল তা যে তিনি পান নি তার কারণ প্রধানতঃ যে ইংরেজ সমাজকে উদ্দেশ করে তিনি কথা বলেছেন তারা তাকে বড়ো একটা আমল দেয় নি। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ইংরেজ রক্ষণশীল জাতি— চিরাচরিত বিশ্বাসকে সে সহজে ছাড়তে চায় না। যে মানুষ নতুন কথা বলে তাকে সে বরাবর সন্দেহের চোখে দেখে।

অমিত রায়ের সঙ্গে আর-একটা ব্যাপারেও শ-এর স্বভাবের মিল আছে। "অমিতের বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উল্টো কথা বলা। সজ্জন-সভায় যা কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু একটা বলে বসবেই।" শ-এর বিরুদ্ধে পাঠকসমাজের বিশেষ করে ব্রিটিশ জাতির ঠিক এই অভিযোগ। অথচ একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে শ-এর কথাবার্তা যতটা উল্টো বা উদ্ভট বলে মনে হয় কার্যতঃ ততটা উদ্ভট নয়। আসলে আমাদের অনেক ধারণা অনেক বিশ্বাস, অনেক কার্যকলাপ অত্যন্ত অযৌক্তিক। শ নিখুঁত যুক্তি এবং নির্মম পরিহাসের সঙ্গে এ সবের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতে পারি নি এবং পারি নি বলেই তাঁকে একটা উপদ্রব বলে মনে করেছি। শ-এর এক গুণগ্রাহী বন্ধু বলেছেন, "It has

been said that Shaw irritates people by always standing on his head, and calling black white and white black. But only simpletons either offer or accept this account···what is really puzzling is that Shaw irritates as intensely by standing on his feet and telling as that black is black and white white, whilst we please ourselves by professing what every one knows to be false."

কঠোর ভাষায় হোক আর পরিহাসের স্বরে হোক অনেক পিলে-চমকানো কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু এ যুগে মানুষের পিলে এত বেশি মজবুদ যে কোনো কিছুতেই পিলে ফাটবার লক্ষণ দেখা যায় না। সভ্য মানুষ কোনো ব্যাপারেই সহজে বিচলিত হয় না। বোধ করি এই কারণেই অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও যতখানি প্রভাব বিস্তার করার কথা ছিল ততখানি তিনি করতে পারেন নি। এই সূত্রে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। মনুসংহিতা শাস্ত্র হিসাবে বড়ো হতে পারে কিন্তু সাহিত্য হিসাবে বড়ো কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। বার্নাড শ এ যুগের সমাজকে নতুন করে গড়বার উদ্দেশ্যে এক নতুন সমাজনীতি বা শাস্ত্র রচনা করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক ন্যায্য কথা বলেছেন; সর্বত্র একটি কঠোর ন্যায়-নিষ্ঠা এবং শুচিতাবোধ বিদ্যমান। কিন্তু সবটা মিলিয়ে একটি শুচিবাইগ্রস্ত মনের আভাস আছে। এ যুগের মানুষ যেমন মনুসংহিতাকে প্রশ্রয় দেয় না তেমনি শ-সংহিতাকেও খুব একটা আমল দেবে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ ইংরেজ জাত এ পর্যন্ত দেয় নি। যতদূর মনে পড়ছে তাঁর নাটকের প্রথম অভিনয় স্বদেশে না হয়ে আমেরিকায় হয়েছে। গুণগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা স্বদেশের চাইতে বিদেশেই বেশি। এমন-কি ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে যতখানি সমাদর হয়েছে ইংলণ্ডে ততখানি হয় নি। শিল্পী সাহিত্যিকরা যদিচ 'সর্বত্র পূজ্যতে' বলে খ্যাত তথাপি বলব আপন দেশের পূজাই আসল পূজা। কোনো সাহিত্যিককে আপন দেশ যদি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ না করে তবে অপরে তাঁকে বড়ো করতে পারে না।

এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন বিপুল পরিমাণে খুব কম লেখকই লিখেছেন, এমন অধিক পরিমাণে ন্যায্য কথাও বোধ করি আর কেউ বলেন নি। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সেটাই বড়ো কথা নয়। সাহিত্যে sense এবং nonsense দুইয়েরই সমান আদর। বার্নাড শ-এর নাটকে যেমন enormous lot of sound sense, শেক্সপীয়ারের নাটকে ( কমেডিতে তো বটেই, অন্যবিধ নাটকেও ) তেমনি enormous lot of delightful nonsense। লক্ষ্য করবার বিষয় যে চার শ' বছর পরেও শেক্সপীয়ার পাঠকসমাজে, রঙ্গমঞ্চে এবং ছায়াছবিতে তাঁর অপ্রতিহত প্রাধান্য বজায় রেখেছেন। বার্নাড শ আজ রঙ্গমঞ্চেও নেই সিনেমার পর্দায়ও নেই; পাঠকসমাজেও স্থান সংকুচিত হয়ে আসচে। অথচ আজকের দিনের সমস্যা নিয়ে আজকের দিনের উপযোগী নাটক তিনিই সব চাইতে বেশি লিখেছেন। মুশকিল হয়েছে এই যে, সারাক্ষণ যুক্তিযুক্ত কথা শোনার ধৈর্য সকল মানুষের থাকে না। অতিরিক্ত অর্থপূর্ণ কথা সাহিত্যে অনেক সময় অনর্থ ঘটায়। ভারবির অর্থগৌরব তাঁকে সাহিত্যে খুব বড়ো স্থান দেয় নি। নিরর্থক কথার ফাঁকে ফাঁকে অর্থপূর্ণ কথা বললে তবেই কথার অর্থগৌরব বাড়ে।

তথাপি বলব বার্নাড শ-এর এই অনাদর কোনো দেশেরই পঠকসমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। Intellectual discipline বা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পক্ষে বার্নাড শ এ যুগে অপরিহার্য। বহু যুগ সঞ্চিত ধ্যান ধারণার ফলে আজকের সমাজ অব্যবস্থিত-চিত্ত। আমাদের সমাজব্যবস্থায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার

জন্যে বার্নাড শ যতখানি করেছেন এমন আর কোনো সাহিত্যিক করেছেন বলে মনে করি না। এই কারণেই বলছিলাম যে শ-কে বা দিলে এ যুগের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এককালে বার্নাড শ এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। আজকে কেন দিচ্ছেন না, সে আমি বুঝতে পারি না। এঁদের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও তেমন হয় নি। হ'লে ভাষার জোর বাড়ত। আমাদের ভাষায় এখনও যুক্তিতর্কের আঁট-বাঁধুনি তেমন আসে নি।

আমাদের পাঠকসমাজ ইদানীং যে শৈথিল্য দেখিয়েছেন সে লজ্জার কথঞ্চিৎ নিরসন করেছেন শ্রীযুত ভবানী মুখোপাধ্যায়। তিনি বার্নাড শ-এর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা করে বাঙালি পাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা আমাদের ভাষায় ইতিপূর্বে হয় নি। বহু তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। তথ্যানুসন্ধান জীবনীকারের অন্যতম কর্তব্য কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব তথ্যের পরিবেশনে। একটি অনন্যসাধারণ জীবনের অনন্যতাকে পরিস্ফুট করে তোলা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সেই কঠিন পরীক্ষায় ভবানীবাবু কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন। অপরপক্ষে শ-রসের সরস বর্ণনায়ও যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

শ যে শুধু নাট্যরচয়িতা এমন নয়, তাঁর সমগ্র জীবনটিই নাটকীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেমন বলা যায় তাঁর জীবনই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য তেমনি বার্নাড শ এর জীবনই তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ নাট্য। এই সত্যটি ভবানীবাবুর গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রই ছিটগ্রস্ত মানুষ। প্রতিভার ছটাই মাথার ছিটে পরিণত হয়। অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এলে যা হয়, অনেক নটনটীর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছেন। এর সুযোগ নিয়ে সস্তা রোমাঞ্চের সৃষ্টি করা যেত এবং জীবনচরিত অনায়াসেই উপন্যাসে পরিণত হতে পারত। কিন্তু সত্যান্বেষী পাঠকমাত্রই জানেন যে শ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বরাবর একটি সাত্ত্বিকতা বজায় রেখে চলেছেন। সুখের বিষয় এই জীবনচরিতে সেই সত্যটি কোনোক্রমে আচ্ছন্ন হয় নি। শ যেমন জীবনের দুর্গম দুঃসাহসিক পথেও পদস্খলন থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছেন তাঁর জীবনীকারও তেমনি সুলভ রোমাঞ্চকতার লোভনীয় পথকে সযত্নে পরিহার করে গিয়েছেন। এইজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

বার্নাড শ-এর স্তিমিত প্রভাব যদি ক্রমে পুনরুজ্জীবিত হয় তবেই ভবানীবাবুর শ্রম সার্থক হবে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

## স্বরলিপি

এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে,
প্রদীপ নিভালে কেন অঞ্চলঘাতে ॥
অন্তরে কালো ছায়া পড়ে আঁকা,
বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাকা,
দুঃখের সাথি তারা ফিরিছে সাথে ॥
কেন দিলে না মাধুরীকণা, হায় রে কৃপণা।
লাবণ্যলক্ষ্মী বিরাজে ভুবন-মাঝে,
তারি লিপি দিলে না হাতে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II র্সর্রা -া । র্সর্রা -া র্সা -া I ণা -ধা । পধা -া পমা -গা I মা -া । পা -া -া -া I
এ ০ সে০ ০ ছি ০ নু ০ দ্বা০ ০ রে০ ০ ত ০ ব ০ ০ ০

I গা -া । মা -া মা -গা I মণা -া । ধা -া -া -া I ধা -া । ধা -া ধা -া I
শ্রা ০ ব ০ ণ ০ রা০ ০ তে ০ ০ ০ প্র ০ দী প্ নি ০

I ধা -া । ধা -া ধা -া I ধা -া । -ণা -া -া -া I ণা -া । ণা -া ণা -া I
ভা ০ লে ০ কে ০ ন ০ ০ ০ ০ ০ অ ন্ চ ০ ল ০

I ণা -র্সা । ধা -া -না -া I না -া । না -া না -া I না -া । না -া না -া I
ঘা ০ তে ০ ০ ০ প্র ০ দী প্ নি ০ ভা ০ লে ০ কে ০

I নর্সা -া । -া -া -পা -ধা I ণা -র্রা । র্রা -র্সা র্সা -র্রা I র্সা -া । র্সা -ণা -া -া I
ন০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ন্ চ ০ ল ০ ঘা ০ তে ০ ০ ০

I ধা -ণা । ধা -ণা ধা -া I পা -া । মা -া গরা -গা I মা -া । পা -া -া -া I
এ ০ সে ০ ছি ০ নু ০ দ্বা ০ রে০ ০ ত ০ ব ০ ০ ০

I { গা -া । মা -ণা ধা -না I না -া । না -া না -া I র্সা -া । -া -া -া -না I
অ ন্ ত ০ রে ০ কা ০ লো ০ ছা ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I না -া । না -া না -া I র্সা -া । -া -া -পা -া I মা -া । মা -পা পা -া I
প ০ ড়ে ০ আঁ ০ কা ০ ০ ০ ০ ০ বি ০ মু ০ খ ০

I পা -া । পা -া ধা -া I ধা -া । ধা -া -ণা -া I ধা -র্সা । ণা -া ণা -ধা I
মু ০ খে ০ র ০ ছ ০ বি ০ ০ ০ ম ০ নে ০ র য়্

I পধা -ণা । ধা -া -া -া } I র্সা -া । র্সা -র্মা র্মা -া I র্গা -া । র্মা -া র্মা -র্গা I
ঢা০ ০ কা ০ ০ ০ তু ক্ খে ০ র ০ সা ০ থি ০ তা ০

I র্রা -র্জ্জা । র্রা -র্জ্জা র্রা -া I র্সা -া । না -া র্সা -া I না -র্সা । নর্সা -র্রা র্সা -া I
রা ০ ফি ০ রি ০ ছে ০ সা ০ থে ০ এ ০ সে০ ০ ছি ০

I ণা -া । পা -ধা পমা -গা I মা -া । পা -া -া -া I { ধা -া । ধা -া ধা -া I
দু ০ দ্বা ০ রে০ ০ ত ০ ব ০ ০ ০ কে ০ ন ০ দি ০

I ধা -া । ধা -া -ণা -া I ণা -া । ণা -া ণা -া I ণা -া । ণা -র্সা -ণা -া I
লে ০ না ০ ০ ০ মা ০ ধু ০ রী ০ ক ০ ণা ০ ০ ০

I ণর্সা -ণা । ণর্সা -ণা ণা -ধা I পধা -ণা । ধা -া -া -া } I ধর্গা -া । র্গা -া র্গা -া I
হা০ য়্ রে০ ০ কু ০ প০ ০ ণা ০ ০ ০ লা ০ ব ণ্ ণ ০

I র্গা -া । র্গা -া র্গা -া I র্গা -া । র্গা -া -র্মা -া I র্গা -া । র্রা -া র্সা -না I
ল ক্ খী ০ বি ০ রা ০ জে ০ ০ ০ ভু ০ ব ০ ন ০

I না -া । সা -া -া -া I না -া । না -া না -া I ন্র্সা -া । -া -া -পা -ধা I
মা • ঝে ০ ০ ০ তা ০ রি ০ লি ০ পি • ০ ০ ০ •

I ণা -র্রা । র্রা -র্সা র্সা -া I র্সা -ণা । ধা -া পা -ধা I পা -ধা । পা -ধা পা -া I
দি ০ লে ০ না ০ হা ০ তে ০ এ ০ সে ০ ছি ০ মু ০

I মা -গা । রা -গা মা -া I পা -া । -া -া -া -া II II
ঘা ০ রে ০ ত ০ ব ০ ০ ০ ০ ০

## সম্পাদকের নিবেদন

অপরিণত বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন বিবেকানন্দ। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি এবং মৃত্যু ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তারিখে। পুরো চল্লিশ বৎসরও তিনি জীবিত ছিলেন না। জীবনের মেয়াদ তাঁর বড় ছিল না বলেই সম্ভবত তাঁর জীবনের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে দ্রুতগতিতে। বিশ্বখ্যাতি তিনি লাভ করেন ১৮৯৩ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রূপে অভিষিক্ত হন ১৯১৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল স্থির, লক্ষ্যের পথে দ্রুতগতিতে তাঁকে অগ্রসর হতে হয় নি।

অপরিণত বয়সে লোকান্তরিত হলেও বিবেকানন্দের চিন্তায় ও কর্মে পরিণতির লক্ষণ স্পষ্ট। বহু বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, তার মধ্যে বাংলা ভাষাও একটি। মৃত্যুর বছর-দুই আগে, ১৯০০ সালে, তিনি বাংলাভাষা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন আমরা এখানে তা থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করি—

"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান ও সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃত, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি পাণ্ডিত্য হয় না? চল্‌তি ভাষায় কি শিল্পনৈপুণ্য হয় না?"

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ প্রায়-সমবয়সী। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা লিখেছেন রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে তার একটি অংশ ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উক্তি এই সংখ্যায় মুদ্রণ করে আমরা বিবেকানন্দের জন্মশতপূর্তি উপলক্ষে নূতন করে তাঁকে স্মরণ করলাম। এবং সেই সঙ্গে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি রচনাও প্রকাশ করা হল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) মহাশয়ের জন্মশতপূর্তি এই বছর। এই উপলক্ষে আমরা তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করে রবীন্দ্রসুহৃদ্‌ রামানন্দকেও স্মরণ করার সুযোগ গ্রহণ করেছি।

## স্বী কৃ তি

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

বিবেকানন্দের চিত্রের ব্লক উদ্বোধন'এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়